বৈদিক স্রোতের ভাসমান নারী : যে মানুষ নয় আদৌ, অন্য কিছু

রণদীপম বসু

এটা কোনো কথার কথা নয়

মানব সভ্যতার ইতিহাস আসলে ধর্মেরই ইতিহাস। সম্ভবত কথাটা বলেছিলেন দার্শনিক ম্যাক্স মুলার, যিনি প্রাচীন ভারতীয় দর্শন তথা বৈদিক সাহিত্য বা সংস্কৃতিরও একজন অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতিমান। তবে যে-ই বলে থাকুন না কেন, সভ্যতার এক দুর্দান্ত বিন্দুতে দাঁড়িয়েও উক্তিটির রেশ এখনো যেভাবে আমাদের সমাজ সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে খুব দৃশ্যমানভাবেই বহমান, তাতে করে এর সত্যতা একবিন্দুও হ্রাস পায় নি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অনেক বেশিই প্রকট। কেননা বর্তমান বিশ্বে এমন কোনো সভ্যতার উন্মেষ এখনো ঘটে নি, যেখানে মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহোৎসব উদযাপন তথা প্রাত্যহিক জীবনাচরণের একান্ত খণ্ড মুহূর্তগুলো কোনো-না-কোনো ধর্মীয় কাঠামো বা অনুশাসনের বাইরে সংঘটিত হবার নিরপেক্ষ কোনো সুযোগ পেয়েছে আদৌ। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, গোষ্ঠীর সাথে গোষ্ঠীর, সমাজের সাথে সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতগুলো এখনো ধর্মকেন্দ্রিকতার বাইরে একচুলও ভূমিকা রাখতে পারে নি বলেই মনে হয়। এমনকি মানুষ হিসেবে আমাদের ব্যক্তি বা সামাজিক পরিচয়ের অন্তঃস্থ চলকগুলোও নিরেট ধর্মীয় পরিচয়েই মোড়ানো। একেবারে বহিরঙ্গের পরিচ্ছদে যে যেই রঙের আঁচড়ই লাগাই না কেন, এই আলগা পোশাকের ভেতরের নিজস্ব যত্নশীল শরীরটা যে আসলেই কোনো-না-কোনো ধর্মীয় ছকের একান্তই অনুগত-বাধিত হয়ে আছে, তা কি আর স্বীকার না-করার কোনো কারণ সৃষ্টি করতে পেরেছে? অন্তত এখন পর্যন্ত যে পারে নি তা বলা যায়। আর পারে নি বলেই আরো অসংখ্য না-পারার ক্ষত আর খতিয়ানে বোঝাই হতে হতে আমরা ব্যক্তিক সামাজিক ও জাতিগতভাবেও একটা ঘূর্ণায়মাণ বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ছি কেবল, বাইরের সীমাহীন সম্ভাবনায় পা রাখতে পারছি না সহজে। এবং একই কারণে আমাদের সমাজ-সংগঠন-চিন্তা বা দর্শনের জগৎটাও অসহায়ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা স্থবির বা অনতিক্রম্য বিন্দুতে। বাড়ছে না আমাদের বৃত্তাবদ্ধতার আয়তন বা সংগঠিত করা যাচ্ছে না কোনো সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডও। কিন্তু কেন তা ভাঙা সম্ভব হচ্ছে না?

প্রশ্নের আকার যত শীর্ণই হোক না কেন, ভাবগত অর্থে এত বিশাল একটা প্রশ্নকে সামনে রেখে কোনো একরৈখিক আলোচনা যে আদৌ কোনো মীমাংসা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে একান্তই অকার্যকর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে আলোচনার কান ধরে টান দিলে হয়ত এমন অনেক প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সামনে চলে আসার সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেয়া যাবে না, যেগুলোর যথাযথ উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যেই কোনো-না-কোনো সমাধানের বীজ লুকিয়ে থাকতে পারে। সে বিবেচনায় একেবারে নিশ্চুপ থাকার চেয়ে কিঞ্চিৎ হল্লাচিল্লা করায় সম্ভাব্য সুবিধা রয়েছে বৈ কি। তাই সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতির বহুমাত্রিক স্রোতে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে মানুষের লিঙ্গীয় অবস্থান বা আরো খোলাশা করে বললে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর অর্ধাংশ জুড়ে যে নারী, তাঁর ভূমিকা, কার্যকর প্রভাব ও অবস্থান চিহ্নিত করতে গেলে অনিবার্যভাবেই প্রচলিত ধর্ম ও অনিরপেক্ষ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গটি অনায়াসে সামনে চলে আসে। অনিরপেক্ষ বলা হচ্ছে এজন্যেই যে, আমাদের ধর্মীয় চেতনদৃষ্টি যে প্রকৃতপক্ষেই লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক ও সুস্পষ্টভাবেই পুরুষতান্ত্রিক পরম্পরায় গড়ে ওঠা, তা বোধকরি অস্বীকার করার উপায় নেই। এক্ষেত্রে আলোচনার মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে খুব সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাপঞ্জির ওপর চোখ বুলিয়ে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধকরি।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রসঙ্গে

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর যে প্রস্তাবনা প্রকাশ করা হয়েছে, তার বিপক্ষে কোনো কোনো ধর্মীয় সংগঠন থেকে পত্র-পত্রিকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হতে দেখেছি আমরা। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া বাস্তবে এতটাই উগ্র রূপ নিতে গেল যে, এই প্রস্তাবিত নারীনীতির সাথে প্রচলিত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাতময় প্রেক্ষাপটটি আসলে কোথায়, সচেতন নাগরিক হিসেবে তা খুঁজে দেখার কৌতূহল এড়ানোর উপায় নেই।

নারীনীতি ২০১১-এর পটভূমিতে বলা হয়েছে—

> নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালী কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন "তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক"। তার এ আহ্বানে নারীর অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে।...

খুবই সুন্দর কথা। তাই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বিষয়ক পুরো চব্বিশ পৃষ্ঠার পিডিএফ ফাইলটিতে খোঁজার চেষ্টা করা হলো তথাকথিত ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে সমাজের অহিতকর কোনো উপাদান সেখান থেকে উদ্ধার করা যায় কি না। সমস্যা হলো দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। ব্যক্তি আমি যাকে

অত্যন্ত হিতকর ভাবছি, অন্য কেউ হয়ত ভিন্ন ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যস্ততার কারণে তাকেই অহিতকর মনে করছেন। তাছাড়া অন্য যেকোনো নারীনীতির মতোই এখানেও সুন্দর সুন্দর কথাসর্বস্ব বক্তব্যের কোনো কমতি চোখে পড়ে নি। হয়ত আরো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বা বক্তব্য রয়ে যেতে পারে, তবু সম্ভাব্য নমুনা হিসেবে এ থেকে ক্রমিক অবস্থানসহ খুব সংক্ষেপে কিছু বক্তব্য চিহ্নিত করলে তা নিম্নরূপ দাঁড়ায়—

১৬.১ বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
১৬.৮ নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।
১৬.১১ নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা।
১৬.১২ রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
১৭.১ মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সমঅধিকারী, তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা।
১৭.২ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
১৭.৩ নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।
১৭.৫ রাষ্ট্রীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা।
১৭.৬ বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন না করা বা বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া।
১৮.৪ কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।
২৩.৭ নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরী, শ্রম বাজারে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে সমসুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।

ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক চমৎকার কথামালা জুড়ে দেয়া হয়েছে প্রস্তাবিত নারীনীতিটির পরতে পরতে। কিন্তু এই পোড়ার দেশে এরকম সুন্দর সুন্দর কথা তো আর কম শুনি নি আমরা। নীতিমালার সৌন্দর্যবর্ধনের জন্যে এরকম সুন্দর ও মায়াবী কথামালা যে বলতে হয়, তা বোধকরি আমাদের অভ্যস্ততায় গা-সওয়া হয়ে গেছে বলেই আমরা এটাও বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে এগুলো আদৌ বাস্তবায়িত হবার নয়। অন্তত যতদিন না আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাটার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে, ততদিন এসব যে কথার কথা হয়েই থাকবে তা আমাদের ধর্মগুরুরা ভালো করে জানেন বলেই এ নিয়ে খুব একটা গা করেন নি হয়ত। নইলে এই নীতিবয়ানগুলোর অধিকাংশই যে প্রচলিত অনড় ও প্রাচীন ধর্মীয় অনুশাসনের বিশুদ্ধতার সাথে সাংঘর্ষিক তা কি আর ব্যাখ্যা করে বলতে হয়? এগুলোর একটু এদিক-ওদিক করেই আগের নারী নীতিমালায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল বৈকি। কিন্তু হঠাৎ করে নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ নিয়ে ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর এমন সক্রিয় হয়ে ওঠার প্রত্যক্ষতায় খটকা লাগে। সত্যি কি এখানে এমন কিছু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা তাদের পক্ষে এখন আর সহ্য করা অসমীচীন মনে হচ্ছে? আবারো ভালো করে চোখ বুলিয়ে সম্ভাব্য আরেকটা পয়েন্ট পেলাম এরকম—

২৫.২ উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।

ঠিক মনে করতে পারছি না, আগের কোনো নারী উন্নয়ন নীতিতে 'উত্তরাধিকার' শব্দটি এভাবে ব্যবহৃত কিংবা এরকম কোনো বাক্য উদ্ধৃত হয়েছিল কি না। কর্মস্থলে বা আশেপাশের অনেকের মুখে ধর্মীয় উগ্রবাদীদের কথিত বক্তব্যের মতোই আশ্চর্যজনকভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মবিরোধী আইন তৈরির সম্ভাব্য আশঙ্কার প্রতিধ্বনি শুনে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি আদৌ কি সেরকম কিছু রয়েছে? তাদের আশঙ্কার কারণটাও বোঝার বাকি থাকে না যে, হয়ত নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপ করে নারীকে সম্পদের উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মতো কোনো আইন এ সরকার তৈরি করে ফেলতে পারে বলে সমূহ আশঙ্কায় এরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে এরকম কিছু মনে হলো না বা নারীনীতির কোথাও সেরকম কোনো আলামতও চোখে পড়ল না। এদিকে সরকারপক্ষের প্রতিনিধিদের বক্তব্যেও এটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, প্রচলিত ধর্মীয় বিধান বা আইন ভঙ্গ হয় সেরকম কোনো বিষয় এখানে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। আর তা যে হওয়া সম্ভবও নয় এটা দুয়ে দুয়ে চারের মতোই পরিষ্কার। সব মিলিয়ে কেমন একটা তালগোল পাকানো অবস্থা যেন। কিন্তু কেন এমন মনে হচ্ছে? এখানেই আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক মনস্তত্ত্ব, ধর্মীয় কাঠামোয় পুরুষের আধিপত্যবাদী লিঙ্গবৈষম্য এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণকামিতার মূল সুরটি প্রকটভাবে ফুটে ওঠে।

ধর্মীয় রীতিনীতি এড়িয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা আসলে কতটুকু?

এই যে নারীনীতি নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে এত হল্লা, বর্তমান ধর্মীয় বাস্তবতায় এখানে রাষ্ট্রের অভিন্ন কিছু কি করার আছে আদৌ? অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা কতটুকু এর উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের প্রথমেই বুঝে নিতে হয় ধর্ম কী এবং রাষ্ট্রই বা কী, এতদবিষয়ক

নানা প্রশ্ন ও সিদ্ধান্তগুলো। সভ্যতার সেই উন্মেষকাল থেকেই দার্শনিক ও সমাজ-রাষ্ট্রনীতিকরা এর উত্তর খুঁজেছেন বৈকি। সে মোতাবেক যদি আমরা ধরে নেই যে রাষ্ট্রের প্রধান শর্তগুলো হচ্ছে এর একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী থাকবে, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য স্বীকৃত ও বিধিবদ্ধ একটা সংবিধান থাকবে, আর এই জনগোষ্ঠীর অনুকূলে সংবিধানের আলোকে কতকগুলো নিয়ম-নীতি থাকবে; যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকদের ইচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে, তাহলে এই প্রতিফলনের মধ্যেই রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তিটা নিহিত থাকে বলা যায়। অতএব অন্যান্য অনেক জাতিগোষ্ঠীর মতোই আমাদেরও একটা রাষ্ট্র রয়েছে ঠিক, এর নির্দিষ্ট ভূখণ্ড রয়েছে এবং চমৎকার একটি সংবিধানও রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত ধর্মভিত্তিকতার নিগড় ভেঙে রাষ্ট্রের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর প্রতিটি নাগরিকের জন্য এক ও অভিন্ন মানবিক অধিকার ও জীবনধারা প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় আদৌ কি সম্ভব?

এটা একটা শাশ্বত প্রশ্ন বটে, যেকোনো রাষ্ট্রের জন্যেই যা প্রযোজ্য। কারণ রাষ্ট্রের এই সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীও কোনো অভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসে একাত্ম নয়। যে বিশ্বাসের মধ্যেই প্রোথিত আছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন জীবন-সংস্কৃতি, লৈঙ্গিক অবস্থান, সম্পদ ও সম্পত্তির বণ্টন ও ভোগের উত্তরাধিকার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষিতগুলো। এই বিশ্বাসই যেখানে নির্ধারণ করে দেয় নারী ও পুরুষের প্রকৃত ভূমিকা, প্রভাব ও আপেক্ষিক ক্ষমতা, সেখানে রাষ্ট্রের অবস্থান আসলে কোথায়? এক বিশ্বাসের বর্ণবাদী কোপে যেখানে পুরুষগুলো নিজেরাই হয়ে যায় পরস্পর-অনাত্মীয়, অন্য বিশ্বাসে আরেকজন ব্যক্তি মুক্তচিন্তার কারণে হয়ে যায় হননযোগ্য মুরতাদ। এক বিশ্বাসে যেখানে একজন নারীজন্মের অপরাধে হয়ে যায় যত্রতত্র স্থিতিহীন উন্মুল সত্তা, অন্য বিশ্বাসে সেখানে আরেক নারী আটকে যায় আমৃত্যু ক্রীতদাসত্বের অবিচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে। ফলে নারী-পুরুষের বৈষম্য নিরসন দূরের কথা, ভিন্নধর্মীয় দু'জন নারীর মধ্যকার অধিকার-বৈষম্য রোধ করাই তো রাষ্ট্রের জন্য সুদূরপরাহত ব্যাপার। অতএব একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা নামের সুদৃশ্য কোনো আবরণ দিয়ে নাগরিক বহিরঙ্গের পরিচ্ছদটাকে নানারূপে রঙিন করা যেতে পারে হয়ত, কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাস নামের মায়াবী বেড়িটাকে ভাঙতে না-পারলে পোশাকের আড়ালে ঢেকে রাখা মানব শরীরের অনপনেয় ক্ষতগুলো সারানো যাবে না কিছুতেই। মানব সভ্যতার সামাজিক শরীরে নারীর প্রতি বৈষম্য নামক দুষ্ট ক্ষতটির উৎসমূলটা সেখানেই।

ধর্ম ও রাষ্ট্র

আরোপিত ধর্মীয় অনুশাসন আর বৈষম্যহীন রাষ্ট্রীয় বিধান আসলে দুটো স্বতন্ত্র সত্তা। এবং মানব সভ্যতার উৎকর্ষ অর্জন ও তার নাগরিকদের ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা যেকোনো বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে রেখে সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সমতা আনয়নের লক্ষ্যে যেকোনো কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মানবিক আইনই সর্বোচ্চ কার্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন হবার কথা থাকলেও বাস্তবে তা সম্পূর্ণই বিপরীত অবস্থায় রয়েছে। কিংবা ওই কল্যাণকামী রাষ্ট্রই এখানে অনুপস্থিত। ধর্মীয় অনুশাসনই মূলত সর্বব্যাপ্ত হয়ে গিলে রেখেছে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাগুলোকে। ফলে এখানে প্রকৃতপক্ষে কোনো মানুষ থাকে না বা মানবাধিকারের অস্তিত্ব যৌক্তিকভাবেই অনুপস্থিত এখানে। যা থাকে তা হলো বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ধর্মীয় পরিচয়বাহী মানবসদৃশ তথাকথিত শ্রেষ্ঠ প্রাণীদের যদৃচ্ছ পদচারণা। একে কি মুক্ত মানুষের স্বাধীন বাসযোগ্য পরিপূর্ণ মানবসভ্যতা বলা যায়? ধর্মকে স্বাধীনভাবে মানা বা না-মানার অধিকার যেখানে বলবৎ থাকে, সেটাই তো প্রকৃত মানব-রাষ্ট্র বা সভ্যতা। মূলত সেটাই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবার কথা। কারণ সেখানে ধর্ম মানা বা না-মানার ওপর নাগরিক মানুষের অধিকার ও উত্তরাধিকার চিহ্নিত হয় না। ওই রাষ্ট্রের নাগরিকের পরিচয় সেখানে নারী বা পুরুষ হিসেবে নয়, কিংবা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, বাঙালি, অবাঙালি, গারো, চাকমা, উচ্চবর্ণ বা নিম্নবর্ণ ইত্যাদি কোনো কিছু নয়। তার একমাত্র পরিচয় সে মানুষ এবং রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক। অতএব তার নাগরিক অধিকারের সমতা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্রই। আর এই অধিকার নিশ্চিত করতে হলেই ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, জাতি নির্বিশেষে অন্যান্য সকল নাগরিক অধিকারের মতোই তাদের পারিবারিক সম্পদ ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার অভিন্ন সমতাও নির্ধারণ করে দেবে রাষ্ট্রব্যবস্থা। যেখানে নাগরিক যোগ্যতা কোনো ধর্ম বা জন্মের কারণে চিহ্নিত হবে না, এক্ষেত্রে কর্মই হবে মুখ্য। যেহেতু এ ব্যবস্থায় নারীও একজন মানুষ, তাই এখানে বৈষম্য রোধ করার জন্যে এখনকার মতো কোনো অমূলক ও অপমানজনক নারীনীতি প্রণয়নেরও প্রয়োজন হবে না আর।

খুব সংগত কারণে এবার প্রশ্ন আসে, তাহলে কীভাবে আমরা এই ব্যবস্থাটাকে নিশ্চিত করতে পারি? এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে একটা উত্তর তৈরি হয়ে যাবার কথা। আর যা-ই করতে চাই না কেন, প্রথমেই চেষ্টা হবে ধর্মীয় ব্যবস্থা নামের অসভ্য বেড়িটাকে আমাদের সভ্য শরীর ও মন থেকে খুলে নিয়ে কেবল একটা ঐচ্ছিক বা ভিন্নলৌকিক বিশ্বাসের বস্তু হিসেবে একপাশে সরিয়ে রাখা। কারণ এই চিন্তাচ্ছন্ন ব্যবস্থাটার যেদিন জন্ম হয়েছে, সেদিন থেকেই মানুষ আর মানুষ থাকে নি। ধনসম্পদ ভোগলিপ্সার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকেন্দ্রিকতায় ধর্মীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চতুরতায় গোটা সমাজটা বিভক্ত হয়ে গেছে, আরো অনেক বিভক্তির মতোই অমানবিক পুরুষ আর মানবেতর নারীতে। অপ্রতিরোধ্য পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের নির্লজ্জ হাতিয়ার হয়ে এই ধর্মীয় ব্যবস্থায় প্রভু-ভৃত্যের এক অন্ধকার সম্পর্কের বলি হয়ে গেছে স্বাধীন মানবসত্তা। নির্জলা মিথ্যা আর যুক্তিহীন কল্পনার আশ্রয়ে গড়ে ওঠা এক নিষ্ঠুর অমানবিক প্রতারণার নামই যে প্রচলিত ধর্মতত্ত্ব, তা বুঝতে হলে আমাদের চিন্তাটাকে অবাধ ও মুক্ত করে দেয়ার কোনো বিকল্প নেই। তাহলেই কান টানলে মাথা আসার মতোই বাকি পরিবর্তনগুলো

মানুষের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস। আমরা কি অন্তত একটিবার সক্রিয়ভাবেই সে চেষ্টা করতে পারি না, কী আছে এই ধর্মতত্ত্বের পেছনে তা খুঁজে দেখতে?

ধর্মীয় অমানবিকতার আদিম ধারাটির নাম বৈদিক সংস্কৃতি

জগৎজুড়ে ধর্মীয় সংস্কৃতির যে কটি প্রধান ধারার অস্তিত্ব এখনো বহাল রয়েছে, তার মধ্যে সম্ভবত বৈদিক সংস্কৃতিই প্রাচীনতম। তার উৎস হচ্ছে বেদ, যা বর্তমান হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। অথচ বহিরাগত একদল লিপিহীন বর্বর আক্রমণকারী শিকারি আর্যগোষ্ঠীর দ্বারা এককালের আদিনিবাসী জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধ প্রাচীন হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস হওয়া এবং এই ধ্বংসাবশেষের ওপর ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠা আর্য সংস্কৃতির বিকাশের আর্যাবর্ত ধারাক্রমই মূলত এই বৈদিক সংস্কৃতি। যেখানে আর্যরা হয়ে ওঠে মহান শাসক আর আদিনিবাসী জনগোষ্ঠীটাই হয়ে যায় তাদের কাছে অনার্য বা শাসিত অধম, নামান্তরে দাস বা শূদ্র। তাই এই বৈদিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের মধ্যেই একটি সভ্যতার উন্মেষ ও পর্যায়ক্রমে তার মাধ্যমে ধর্ম নামের একটি শাসনতান্ত্রিক ধারণার জন্ম ও আধিপত্য কায়েমের মধ্য দিয়ে এ ব্যবস্থার পরিণতি পর্যবেক্ষণ করলেই ধর্ম কী ও কেন, এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় বলে বিদ্বানেরা মনে করেন। আর প্রতিটা ধর্মেরই যেহেতু অন্যতম প্রধান শিকার হচ্ছে নারী, তাই আধিপত্যবাদী পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহক এই ধর্মের প্রত্যক্ষ আক্রমণে কীভাবে সামাজিক নারী তার পূর্ণ মানবসত্তা থেকে সমূলে বিতাড়িত হয়ে কেবলই এক ভোগ্যপণ্য চেতনবস্তুতে পরিণত হয়ে যায়, তারও উৎকৃষ্ট নমুনা-দলিল এই প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রই। বয়সে প্রবীণ এই শাস্ত্রের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও সাফল্য থেকেই সম্ভবত পরবর্তী নবীন ধর্মশাস্ত্রগুলো তাদের পুরুষতান্ত্রিক শোষণের হাতিয়ারটাকে আরেকটু আধুনিক ও বৈচিত্র্যময় করে তার শাসন-দক্ষতাকেই সুচারু করেছে কেবল, খুব স্বাভাবিকভাবেই কোনো মৌলিক মানবিক উন্নতি ঘটে নি একটুও। তাই সম্যক পর্যালোচনার খাতিরে আমরা এই বৈদিক শাস্ত্রের বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গগুলো চয়ন করে এতদবিষয়ক কিছু প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা নেয়ার কিঞ্চিৎ চেষ্টা করে দেখতে পারি।

বৈদিক শব্দটি এসেছে 'বেদ' থেকে। 'বেদ' মানে হচ্ছে পবিত্র ও পরম জ্ঞান। 'বেদ' নামে সাধারণ্যে কোনো একটি গ্রন্থবিশেষ বোঝালেও মূলত এটি প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টিকে বোঝায়। যদিও বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়ে থাকে, সামগ্রিকভাবে এই শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টিকেই 'বৈদিক সাহিত্য' বলা হয়। ভারতবর্ষীয় তথা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সর্বপ্রাচীন সাহিত্য এটি।

এখানে স্মর্তব্য যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুটো মূলধারা রয়েছে— বৈদিক ও অবৈদিক। বেদ-বহির্ভূত যা কিছু নিকৃষ্ট(!) ও আদিম, ওই অবৈদিক জড়বাদী (চার্বাক) উপাদান সম্বলিত লোকায়ত ধারাটির গুরুত্ব সেকালে পারতপক্ষে স্বীকার করা হতো না। শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর অনুকূল ভাববাদী বৈদিক ধারাটিরই জয়জয়কার ছিল। বৈদিক ধারার ধারক ও বাহক ছিল 'বৈদিক সাহিত্য' নামের এক বিশাল শাস্ত্র-ভাণ্ডার। তাই বিষয় অনুষঙ্গ হিসেবে এ মুহূর্তে আমাদের লক্ষ্য হতে পারে এই বৈদিক সাহিত্যের কিছুটা সুলুক-সন্ধান করা, যেখানে সুকৌশলে এক আধ্যাত্মিক ভণ্ডামো আরোপ করে খুব সদম্ভেই নারী জাতিকে কেবলই ভোগ্যপণ্য ক্রীতদাসীতে পরিণত করে ফেলা হয়েছে।

রচনাকালের পরম্পরা ও প্রকৃতি অনুযায়ী 'বেদ' চারটি; যথা ১. ঋগ্বেদ, ২. সামবেদ, ৩. যজুর্বেদ ও ৪. অথর্ববেদ। প্রতিটি বেদের আবার চারটি অংশ—

ক. 'সংহিতা' বা সংগ্রহ— গান, স্তোত্র, মন্ত্র প্রভৃতির সংকলন।

খ. 'ব্রাহ্মণ'— গদ্যে রচিত একজাতীয় যাগযজ্ঞ-বিষয়ক সুবিশাল সাহিত্য।

গ. 'আরণ্যক'— অরণ্যে রচিত একজাতীয় সাহিত্য, বিশ্ব-রহস্যের সমাধান অন্বেষণই তার প্রধান উদ্দেশ্য।

ঘ. 'উপনিষদ'— আক্ষরিক অর্থে গুহ্য-জ্ঞান, দার্শনিক তত্ত্বের বিচারই এর প্রধান বিষয়বস্তু। এই উপনিষদকে 'বেদান্ত' সাহিত্যও বলা হয়।

বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশকে কর্মকাণ্ড, আরণ্যককে উপাসনাকাণ্ড এবং উপনিষদকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়। রচনাকাল ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রত্যেকটি অংশের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে বলে স্বীকৃত। বৈদিক সাহিত্যের বহু প্রাচীন অংশই বিলুপ্ত হয়েছে, যা কিছু টিকে আছে তা-ও আয়তনে সুবিশাল।

বেদের সুক্ত বা সংহিতাগুলো অতি প্রাচীনকালে দীর্ঘ সময় নিয়ে রচিত হয়েছে। অর্থাৎ তা কোনো একক ব্যক্তির রচিত নয়। বংশপরম্পরাক্রমে তা মুখে মুখে রচিত হয়েছে এবং শ্রুতির মাধ্যমে তা সংরক্ষিত হয়েছে। তাই বেদকে শ্রুতিগ্রন্থও বলা হয়। বেদের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ থাকলেও ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ বা ২৫০০-এ এর রচনাকাল শুরু হয়ে সম্পন্ন হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব ৭৫০ থেকে ৫০০-এর মধ্যে। সুনির্দিষ্ট কোনো সন-তারিখের হিসেব করা সম্ভব না-হলেও গবেষকদের স্থির সিদ্ধান্ত এটুকু যে, গৌতম বুদ্ধের পূর্বেই এ-সাহিত্যের রচনা ও সংকলন সমাপ্ত হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় বহু শতাব্দীর ব্যবধানের কারণেই বেদের প্রথম দিকের রচনাগুলোর সাথে শেষের দিকের রচনাগুলোর উদ্দেশ্য, ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তর পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে। প্রথম দিকের রচনা সুক্তগুলোতে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সত্তা যেমন অগ্নি, নদী, বাতাস, সোম (এক জাতীয় লতা)-কে দেবতাজ্ঞান করে লিপিহীন আদিম পশুপালক জনগোষ্ঠীর চাওয়া-পাওয়ার লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল। এবং তা

নিবিষ্ট ছিল কোনো যজ্ঞরূপ আয়োজনের মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন ইহলৌকিক জীবনযাত্রার সাধারণ ধনসম্পদ ভোগের কামনার মধ্যে বা কোনো গোত্রপ্রধান ইন্দ্রের প্রতি নিজেদের রক্ষার আবেদনে। ফলে তাকে অনেকটাই আদিম টোটেম উপজাত বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন—

উপঃ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব। নোদা ইদ্রেবতো মদঃ॥

হে সোমপায়ী ইন্দ্র! আমাদের অভিষবের নিকট এস, সোমপান কর; তুমি ধনবান তুমি হৃষ্ট হলে গাভী দান কর। (মণ্ডল ১ সুক্ত ৪ ঋক ২)।

স নো দূরাচ্চাসাচ্চ নি মর্ত্যাদঘায়োঃ। পাহি সদমিদ্বিষবায়ুঃ॥

হে সর্বত্রগামী অগ্নি! তুমি দূরে ও আসন্ন দেশে পাপাচারী মানুষ হতে আমাদের সর্বদা রক্ষা করো। (মণ্ডল ১ সুক্ত ২৭ ঋক ৩)।

আ নো ভজ পরমেষবা বাজেষু মধ্যমেষু। শিক্ষা বষবো অন্তমষ্য॥

পরম অন্ন ও মধ্যম অন্ন আমাদের প্রদান কর, অন্তিকস্থ ধন প্রদান কর। (মণ্ডল ১ সুক্ত ২৭ ঋক ৫) ইত্যাদি।

আর শেষের দিকের এসে রচিত সুক্তগুলোয় এক ধরনের পারলৌকিক ধারণার উপস্থিতি দেখা যায়। অর্থাৎ তাদের আদিম অগভীর বিশৃঙ্খল চিন্তাসূত্রের মধ্যে ততদিনে আরো উন্নত কল্পনার একটা শৃঙ্খলা তৈরি হয়ে গেছে। যেমন—

যত্রে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূবকম্। তত্ত আ বর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥

তোমার যে মন অতি দূরে বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট গিয়েছে, তাকে আমরা ফিরিয়ে আনছি, তুমি জীবিত হয়ে ইহলোকে এসে বাস কর। (মণ্ডল ১০ সুক্ত ৫৮ ঋক ১)।

এই কাল্পনিক পারলৌকিক ধারণাই যে ধর্ম ব্যবস্থার প্রধানতম হাতিয়ার হয়ে পরবর্তীকালের মানবসংস্কৃতিকে বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিংবা তুলনামূলক আরেকটু উন্নত চিন্তার উপস্থিতি দেখতে পাই, যখন বলা হয়—

কিয়তী যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্ষেণ। ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বরং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ॥

কত স্ত্রীলোক আছে, যে কেবল অর্থেই প্রীত হয়ে নারীসহবাসে অভিলাষী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়? যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যার শরীর সুগঠন, সে অনেক লোকের মধ্য হতে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে। (মণ্ডল ১০ সুক্ত ২৭ ঋক ১২)।

অর্থাৎ তখন একটা সুস্পষ্ট সামাজিক কাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে, যেখানে অর্থের বিনিময়ে ভোগ-উপভোগ বা অন্যদিকে নিরাপদ পরিবার গঠনের নীতিবোধ বিরাজ করতে শুরু করেছে সামাজিক আবহে। এই তুলনামূলক পার্থক্যগুলো উপলব্ধি করতে এখানে স্মর্তব্য যে, বেদজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে প্রাচীন ঋগ্বেদের মোট দশটি মণ্ডলের মধ্যে সর্বশেষ দশম মণ্ডলের সুক্তগুলো বেদের পূর্ববর্তী নয়টি মণ্ডলের সার্বিক আবহের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। অর্থাৎ ধারণা করা হয়, আরো বহুকাল পরে হয়ত উপনিষদ যুগে এই দশম মণ্ডলটি ঋগ্বেদে সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য বেদসংহিতা গ্রন্থেও ঋগ্বেদের বহু শ্লোকের পুনরুক্তি রয়েছে। সম্ভবত পরবর্তীকালের ধর্মীয় উপজগুলো এভাবেই কথিত বেদাশ্রিত হয়ে আগ্রাসী ধর্মরথকে তার উদ্দেশ্যমূলক গতিপথে বেগবান করতে সহায়তা করেছে। তাৎক্ষণিক অবস্থায় হাতের সামনে যা চোখে পড়ল, উদাহরণ হিসেবে তা-ই উদ্ধৃত করা হলো। বেদে এ ধরনের উদাহরণ ভূরিভূরি রয়েছে।

উল্লেখ্য বেদের সংহিতাকে আশ্রয় করে পরবর্তীকালে পর্যাক্রমে রচিত অন্য সাহিত্য বা স্মৃতিগ্রন্থগুলো, যেমন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক হয়ে উপনিষদের যুগে এসে পুরোপুরি ভাববাদে প্রবেশ করেছে। ততদিনে ভারতীয় সমাজে হিন্দুইজম বা বৈদিক দর্শন রীতিমতো শেকড় গেড়ে বসেছে; এবং সেগুলোকে আশ্রয় করে পরবর্তীকালে রচিত বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মাধ্যমে ধর্মীয় শাসনতন্ত্র তার শেকড়-বাকড় ছড়িয়ে সমাজদেহে পূর্ণ থাবা বিস্তার করে ফেলেছে। তারই ঐতিহাসিক উৎকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতা, যাকে বৈদিক সংস্কৃতি বা ব্রাহ্মণ শাসনের সংবিধান বললেও বাহুল্য হবে না। সামাজিক বিশ্বাস এমন যে, এর মধ্যেই নিহিত আছে সমস্ত বেদার্থ। অথচ এই মনুসংহিতাই হলো পৃথিবীর অন্যতম বর্বর, নীতিহীন, শঠতা আর অমানবিক প্রতারণায় পরিপূর্ণ বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদের আকর গ্রন্থ। ভারতীয় শ্রুতি ও স্মৃতির পরম্পরায় বৈদিক পরিমণ্ডলের ধর্মীয় দুরূহতা অতিক্রমের জন্যেই উপনিষদগুলোর পরবর্তী ধাপে মনুসংহিতার মতো ধর্মশাস্ত্র সৃষ্ট হয় বলে দাবি করা হয়। এটিকে বেদের নির্যাস স্মৃতিগ্রন্থ হিসেবে দাবি করা হলেও মূলত তা উপর্যুক্ত সবগুলো গ্রন্থেরই নির্যাস নিয়ে রচিত ব্রাহ্মণ্য শাসনতন্ত্রের নীতিসূত্রগ্রন্থ বলে মনে করা হয়। তার আলোকেই হিন্দুধর্মের যাবতীয় রীতিনীতি জীবনযাপন পূজাশাসন আচারবিচার সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং এখনো তার ভিত্তিতেই ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এমনকি বর্তমানেও হিন্দু ধর্মানুসারীদের জন্য প্রয়োগযোগ্য রাষ্ট্রীয় যে বিশেষ আইন, যেখানে 'হিন্দু আইন অনুযায়ী' শব্দ-সমষ্টি দ্বারা ট্যাগ করা হয়ে থাকে, তার অন্যতম উৎস হিসেবেও মনুসংহিতাই প্রধান। অর্থাৎ এটি সমাজ-উদ্ভূত বিশেষ আইনশাস্ত্র হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার হলো, চা থেকে যেমন পেয়ালা গরম হয়ে থাকে, তেমনি বেদের সহনীয়

নিরপেক্ষতার চাইতেও কথিত বেদাশ্রিত মনুসংহিতার আরোপিত অনুশাসনগুলো শতগুণ কট্টর বর্ণবাদী, বৈষম্যমূলক ও তীব্র অমানবিকই শুধু নয়, অদ্ভুত বর্ণাশ্রম প্রচলনকারী এই শাস্ত্রগ্রন্থে বস্তুত মানবিক সত্তাময় মানুষের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। আর নারী তো সেখানে মানুষই নয়, হয়ত অন্যকিছু।

মনুস্মৃতি বা মনুসংহিতার আধিপত্য

প্রায় দুহাজার সাতশত শ্লোকসংবলিত দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত বর্তমানে প্রচলিত 'মনুসংহিতা' ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল আলোচিত গ্রন্থ নিঃসন্দেহে। এটিকে একাধারে স্মৃতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র হিসেবে অত্যন্ত মান্য করা হয়। এটাকে তৎকালীন বৈদিক আর্য সমাজ ও প্রচলিত হিন্দু সমাজের অবশ্য পালনীয় পবিত্র সংবিধান বা সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ জীবনাচরণবিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। মনুসংহিতাকে পরিপূর্ণ একটি ধর্ম ও শাস্ত্র গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এজন্যে যে, এই গ্রন্থে বিশ্বজগৎ বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুনিচয়, গোটা প্রাণিকুল, উদ্ভিদ, গ্রহ-নক্ষত্র-পৃথিবী, আলো-জল-হাওয়া, দিন-রাত্রি-সময়-কাল-যুগ, জীবজগতের উৎস, স্বভাব-চরিত্র-জীবনযাপন, গুণ ও দোষবাচক সমস্ত অনুভব-অনুভূতি, স্বর্গ-মর্ত্য-নরক, জীবলোক-মৃতলোক, সাক্ষী-বিচার-শাসন, আচার-অনুষ্ঠান, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, খাবার-খাদ্য, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, শুচি-অশুচি ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুগত ও ভাবগত বিষয়ের সৃষ্টিরহস্য ব্যবহার-বিবেচনা বর্ণিত হয়েছে কল্পনার সমৃদ্ধ শিখরে অবস্থান করে অত্যন্ত আকর্ষণীয় নিজস্ব ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে। মোটকথা মনুসংহিতা হচ্ছে বিশ্বাসীদের কাছে একটি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমগ্র জীবন বিধান। কারণ এগুলো স্বয়ং মনুর বচন। যদিও শাস্ত্রগ্রন্থটির নাম থেকেই বোঝা যায়, এটি মনুর রচিত সুক্ত বা শ্লোক বা স্মৃতিশাস্ত্র, তবু এই মনুর পরিচয় নিয়েও যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়ে গেছে স্মৃতিশাস্ত্রেই। তাহলে এই মনু কে?

সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ থেকেই বিভিন্নভাবে এই মনুর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তা থেকে মনুর প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। ঋগ্বেদের ২ মণ্ডল ৩৩ সুক্ত ১৩ ঋক-এ ঋষিগণ মরুদগণের উদ্দেশ্যে স্তুতি নিবেদনের সময় পিতা মনুর সুখপ্রদ ঔষধ মনোনীত করার কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে—

> যা বো ভেষজা মরুতঃ শুচীনি যা শন্তমা বৃষণো যা ময়োভু।
> যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তা শঞ্চ যোশ্চ রুদ্রস্য রশ্মি॥
>
> হে মরুৎগণ! তোমাদের যে নির্মল ঔষধ আছে, হে অভীষ্টবর্ষীগণ, তোমাদের যে ঔষধ অত্যন্ত সুখকর ও সুখপ্রদ, যে ঔষধ আমাদের পিতা মনু মনোনীত করেছিলেন, রুদ্রের সে সুখকর ভয়হারী ঔষধ আমরা কামনা করছি। (২.৩৩.১৩)।

আবার অষ্টম মণ্ডলের ৩০ সুক্তের ৩ ঋকে দেবতাদের কাছে ঋষিরা প্রার্থনা জানাচ্ছেন, তাঁরা যেন পিতা মনু থেকে আগত পথ হতে ভ্রষ্ট না হন। দেবতাদের উদ্দেশ্যে মনুর যজ্ঞনিবেদনের কথাও ঋগ্বেদে বহুবার (৮.৩০.২, ১০.৩৬.১০ ও ১০.৬৫.১৪ প্রভৃতি) পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে মনুর এরকম বহু উল্লেখ থেকে তাকে একজন প্রভাবশালী স্বতন্ত্র মানুষ বলে মনে হয় এবং প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে মনুকে মনুষ্যজাতির জনক আদিপিতা, পুরাতন ঋষি, অগ্নিদেবের সংস্থাপক, অর্থশাস্ত্রের প্রণেতা, কৃতযুগের রাজা প্রভৃতিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ঋগ্বেদের সর্বানুক্রমণীতে মনুকে পাঁচটি সুক্তের ঋষি বলা হয়েছে এবং বেদের নিরুক্ত ভাষ্যকার সায়ণ এইসব সুক্তের ভাষ্যে মনু-অর্থে বৈবস্বত মনুর উল্লেখ করেছেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় মনুর নির্দেশকে 'ভেষজ' বলা হয়েছে— 'যদ্বৈ কিং চ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্।' ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে 'সর্বজ্ঞানময়ো বেদঃ সর্ববেদময়ো মনুঃ' উক্তিটির মাধ্যমে মনুর মধ্যে সমস্ত বেদের জ্ঞান নিহিত আছে বলে প্রশংসা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি বলছেন, 'প্রজাপতি (ব্রহ্মা) মনুকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং মনুই প্রজাদের মধ্যে তা প্রচার করেন'— 'প্রজাপতি র্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ' (৩.১১.৪)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় মনু থেকেই প্রজা সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মহাভারতেও অসংখ্যবার মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে কখনো 'স্বায়ংভুব মনু' এবং কখনো বা 'প্রাচেতস মনু'র উক্তি উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩৩৬.৩৮-৪৬) বর্ণিত হয়েছে—

> পুরুষোত্তম ভগবান ধর্মবিষয়ক লক্ষ শ্লোক রচনা করেছিলেন, যার দ্বারা সমগ্র লোকসমাজের পালনীয় ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিলো (লোকতন্ত্রস্য কৃৎস্নস্য যস্মাদ্ ধর্মঃ প্রবর্ততে)। স্বায়ংভুব মনু নিজে ঐ ধর্মগুলি প্রচার করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে উশনাঃ ও বৃহস্পতি মনু-স্বায়ংভুবের গ্রন্থ আশ্রয় করে নিজ নিজ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন।
>
> স্বায়ংভুবেষু ধর্মেষু শাস্ত্রে চৌশনসে কৃতে।
> বৃহস্পতিমতে চৈব লোকেষু প্রতিচারিতে॥

আবার মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতায় বৈবস্বত মনুরও উল্লেখ দেখা যায়। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের উপদিষ্ট যোগের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্জুনকে বলছেন—

> ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্।
> বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ॥ (৪.১)

ভগবান ঐ যোগ পুরাকালে বিবস্বানকে বলেছিলেন এবং বিবস্বান নিজপুত্র বৈবস্বত মনুকে বলেছিলেন। পরে বৈবস্বত মনু ঐ যোগ ইক্ষাকুকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

তবে খোদ মনুসংহিতার মধ্যেই মনুস্মৃতির উদ্ভব কাহিনি বর্ণিত রয়েছে ভিন্নভাবে। স্বয়ম্ভু ভগবান কর্তৃক পূর্বে অপ্রকাশিত এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি ও সংহারের পর্যায়ক্রমিক বিশদ বর্ণনার এক পর্যায়ে এসে মনুসংহিতায় বলা হচ্ছে—

এবং স জাগ্রৎস্বপ্নাভ্যামিদং সর্বং চরাচরম্।
সঞ্জীবয়তি চাজস্রং প্রমাপয়তি চাব্যয়ঃ॥ (১/৫৭)

এইরূপে সেই অব্যয় পুরুষ ব্রহ্মা স্বীয় জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থার দ্বারা এই চরাচর বিশ্বের সতত সৃষ্টি ও সংহার করছেন।

এরপরই আমরা পেয়ে যাই এই শাস্ত্র প্রস্তুতির উল্লেখ—

ইদং শাস্ত্রং তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবদ্ গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্॥ (১/৫৮)

ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে এই শাস্ত্র প্রস্তুত করে আমাকে যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়েছিলেন এবং আমি (মনু) মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করিয়েছি।

প্রখ্যাত শাস্ত্রভাষ্যকার মেধাতিথি মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের এই ৫৮ সংখ্যক শ্লোকের ভাষ্যে বলেন—

'নারদশ্চ স্মরতি। শতসাহস্রো গ্রন্থঃ প্রজাপতিনা কৃতঃ স মন্বাদিভিঃ ক্রমেণ সংক্ষিপ্ত ইতি।' অর্থাৎ এখানে নারদ বলছেন— 'এই গ্রন্থ শতসহস্র বা লক্ষ সন্দর্ভাত্মক; প্রজাপতি (ব্রহ্মা) এটি রচনা করেছেন। তারপর ঐ লক্ষ সন্দর্ভটিকে ক্রমে ক্রমে মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ সংক্ষিপ্ত করেছেন।'

এই একই শ্লোকের টিকায় কুল্লুকভট্ট নারদের উক্তি উল্লেখ করে বলেন—

ব্রহ্মা প্রথমে স্মৃতিগ্রন্থটি প্রণয়ন করেন; তারপর মনু নিজ ভাষায় তার সারসংক্ষেপ করেন এবং সেই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটিই তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করেন।

পুরাণে পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপা কল্পনা করে সেই সেই দ্বীপে সাতটি জাতির পর্যায়ক্রমে বসতি স্থাপনের উল্লেখ দেখা যায়। এই সাতটি ছিল মূল জাতি। প্রত্যেক মূল জাতির আদি পিতা মনু; ফলে মোট সাতজন মনুর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এঁরা হলেন— স্বায়ংভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত। এঁদের মধ্যে বৈবস্বত মনুকে আর্যজাতির আদি পিতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। মনুসংহিতায় এই মনুর কথাই বলা হয়েছে ১/৬১-৬৩ শ্লোকে। শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতে, "এইসব মনু ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। প্রত্যেক মূল জাতির আদি পিতা এক এক জন মনু এবং তাঁদের নামানুসারেই সেই জাতির জীবিতকালকে 'মন্বন্তর' বলা হয়।" মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে (শ্লোক ৩২-৩৫) দেখা যায়, প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে বিরাট পুরুষের উৎপত্তি হয়েছিল এবং সেই বিরাট পুরুষ তপস্যার দ্বারা মনুকে সৃষ্টি করেছিলেন। মনু আবার প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে ক্লেশকর তপস্যা করে যে দশজন প্রজাপতি (এঁরা সকলেই মহর্ষি) সৃষ্টি করলেন, তাঁরা হলেন— মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ। প্রথম অধ্যায়ের শ্লোক ৫৮-৫৯ অনুযায়ী বলা হচ্ছে, ব্রহ্মা মনুসংহিতায় আলোচনীয় শাস্ত্র অর্থাৎ বিধিনিষেধসমূহ প্রস্তুত করে প্রথমে মনুকে অধ্যয়ন করিয়েছিলেন এবং তারপর মনু তা মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে পড়িয়েছিলেন। ভৃগুমনি এই সম্পূর্ণশাস্ত্র মনুর কাছে অধ্যয়ন করলেন। চারটি বর্ণের ও সংকর জাতিগণের ধর্মসমূহ জানার উদ্দেশ্যে মনু-সমীপে আগত মহর্ষিদের মনু জানালেন যে, তিনি এইসব শাস্ত্র ভৃগুকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এই ভৃগুই ঐ শাস্ত্র আদ্যোপান্ত সকলকে শোনাবেন। মনু কর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হয়ে মহর্ষি ভৃগু খুশি হয়ে সকল ঋষিকে তাঁদের জিজ্ঞাস্যের উত্তর দিতে লাগলেন। এভাবেই মনুসংহিতা ভৃগু কর্তৃক সংস্কার ও সংকলিত হয়ে প্রচারিত হলো। এ প্রসঙ্গে মনুসংহিতার সর্বশেষ অর্থাৎ দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকটি লক্ষণীয়—

ইত্যেতন্মানবং শাস্ত্রং ভৃগুপ্রোক্তং পঠন্ দ্বিজঃ।
ভবত্যাচারবান্ নিত্যং যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদ্ গতিম্॥ (১২/১২৬)

ভৃগুর দ্বারা কথিত এই মনু-সৃষ্ট-শাস্ত্র নিয়মিত পাঠ করতে থাকলে দ্বিজগণ সতত আচারনিষ্ঠ হন এবং যথাভিলষিত উৎকৃষ্ট গতি অর্থাৎ স্বর্গ লাভ করেন।

এইসব শাস্ত্রীয় বিভ্রম বা অহেতুক বিভ্রান্তিকর তথ্য উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপ্তিতে এই মনুসংহিতার অসাধারণ শাস্ত্রীয় গুরুত্ব এবং তার সমকালীন প্রভাব ও প্রাধান্যটুকু সম্যক ধারণা নেয়ার জন্যে। প্রাচীনকাল থেকেই যে এই মনুসংহিতাকে স্মৃতিশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে, বহু প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থেই এর উল্লেখ রয়েছে।

যেমন রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দেখা যায়, রামচন্দ্রকর্তৃক আহত বানররাজ বালি রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করলে রামচন্দ্র মনুসংহিতা থেকে দুটো শ্লোক উদ্ধৃত করে নিজ দোষ ক্ষালনে উদ্যোগী হয়েছিলেন—

রাজভিঃ ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥
শাননাদ্ বাপি মোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

মানুষ পাপ করলে যদি রাজা তাকে দণ্ড দেন, তবে সে পাপমুক্ত হয়ে পুণ্যবান ব্যক্তির ন্যায় স্বর্গে যায়; রাজার দ্বারা শাসিত হলে, অথবা বিচারের পর বিমুক্ত হলে, চোর চৌর্যপাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু রাজা চোরকে শাসন না করলে তিনি নিজেই ঐ চৌর্যপাপের দ্বারা লিপ্ত হন।

রামায়ণে উদ্ধৃত এই শ্লোক দুটি মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের ৩১৬ ও ৩১৮ সংখ্যক শ্লোকে প্রায় একইভাবে পাওয়া যায়। এ থেকে মনে করা যায়, রামায়ণের সময়েও শ্লোকাকারে মনুসংহিতা আংশিকভাবে হলেও প্রচলিত ছিল।

৮০০ থেকে ৮২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত টীকাকার বিশ্বরূপ তাঁর যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকায় মনুসংহিতা থেকে দুশটিরও বেশি শ্লোকের পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক উদ্ধৃতি দিয়েছেন বলে P.V. Kane দেখিয়েছেন। সপ্তম শতকে আবির্ভূত বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী বা মায়াবাদের জনক শঙ্করাচার্য তাঁর বেদান্তসূত্রভাষ্যে প্রায়ই মনুসংহিতা থেকে শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়েছেন (উল্লেখ্য, বর্তমানকালের প্রচলিত হিন্দু দর্শন শঙ্করাচার্যের এই মায়াবাদের ওপরই আশ্রিত বলা যায়)। মোটামুটিভাবে চতুর্থ-পঞ্চম শতকের লোক মহাকবি কালিদাস তাঁর রচিত রঘুবংশের প্রথম সর্গে ১৭ সংখ্যক শ্লোকে দিলীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

এই রাজার শাসনপ্রভাবে মনুর সময় থেকে প্রচলিত চিরাচরিত আচার-পদ্ধতি থেকে তাঁর প্রজারা বিচলিত হন নি—

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদা মনো র্বত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তু র্নেমিবৃত্তয়ঃ॥

আবার চতুর্দশ সর্গে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে কালিদাস বলেছেন—

রাজা যাতে বর্ণ ও আশ্রম সুরক্ষিত করতে পারেন, তার জন্য মনু কিছু ধর্ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন—

নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং যৎস এব ধর্মো মনুনা প্রণীতঃ।

২০০ থেকে ৩০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের নবম অঙ্কে মনুর একটি অনুশাসনের উল্লেখ রয়েছে এভাবে—

অয়ং হি পাতকী বিপ্রো ন বধ্যো মনুরব্রবীৎ।
রাষ্ট্রাদস্মাত্তু নির্বাস্যো বিভবৈরক্ষতৈঃ সহ॥

মনুর মতানুসারে পাপাচারী ব্রাহ্মণ বধ্য হবেন না, বরং এঁকে এঁর সমস্ত ধন-সম্পদের সাথে রাজ্য থেকে বহিস্কৃত করাই বিধি।

৫০০ খ্রিষ্টাব্দের বেশ কিছুকাল আগেই আবির্ভূত জৈমিনি-সূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী তাঁর ভাষ্যে মনু ও অন্য কয়েকজনকে উপদেশদাতা রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায় থেকে একটি স্মৃতিবিষয়ক শ্লোক (৪১৬ সংখ্যক) স্মরণ করেছেন এভাবে—

এবং চ স্মরতি। ভার্যা দাসশ্চ পুত্রশ্চ নির্ধনা সর্ব এব তে।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্॥

স্মৃতিকারগণের মতে, ভার্যা, পুত্র ও দাস— এরা তিনজনই অধম; এরা তিনজনেই যা কিছু অর্থ উপার্জন করবে, তাতে এদের কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, পরন্তু এরা যার অধীন ঐ ধন তারই হবে।

এসব উদাহরণ থেকে অনুমান করা ভুল হবে না যে আনুমানিক দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দ থেকেই এই মনুসংহিতাকে স্মৃতিশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। ফলে এটাও স্পষ্ট যে, এই সময়ের আগেই অর্থাৎ দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই মনুসংহিতা রচনা সম্পন্ন হয়েছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতক থেকে খ্রিষ্টাব্দ ২য় শতকের মধ্যে মনুসংহিতা রচিত হয়েছিল।

আবার ল্যের অর্থশাস্ত্রেও কয়েকবার মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ল্যে বা চাণক্য মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময় (৩২০-৩১৫ খ্রিঃ পূর্বাব্দ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। অতএব এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মনুর নামে প্রচলিত কিছু শ্লোক ৩২০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগেই প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কয়েকটি উক্তির সাথে মনুসংহিতার বর্ণনার সামঞ্জস্য দেখা যায়। যেমন, 'কন্যাদানং কন্যামলংকৃত্য ব্রাহ্মো বিবাহঃ। সধর্মচর্যা প্রাজাপত্যঃ। গোমিথুনাদানাদার্ষঃ। অন্তর্বেদ্যামৃত্বিজে দানাৎ দৈবঃ।' ইত্যাদির সাথে মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের বিভিন্ন ধরনের বিবাহের প্রকৃতি ও স্বরূপ বর্ণনা সংবলিত ২৪, ২৭-৩৪ শ্লোকগুলোর সাদৃশ্য

লক্ষণীয়। আবার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং কামন্দকীয় নীতিসারে 'ইতি মানবাঃ' বলে যে অভিব্যক্তি আছে, টীকাকারেরা 'মানবাঃ' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন 'মানবাঃ মনোঃ শিষ্যাঃ' এভাবে। এ থেকে ধারণা করা হয় 'মানবাঃ' শব্দটি মনুর দ্বারা প্রচারিত শ্লোকগুলোকে আশ্রয় করে পরবর্তীকালে রচিত ধর্মশাস্ত্রগুলোর রচয়িতাদের বোঝানো হয়েছে; এদের মধ্যে অবশ্য ভৃগুই ছিলেন প্রধান। অতএব 'ইতি মানবাঃ' নামে কৌটিল্য সম্ভবত ভৃগুরচিত বর্তমানে প্রাপ্ত মনুসংহিতার কথাই বলতে চেয়েছেন।

আরেক স্মৃতিশাস্ত্রকার বৃহস্পতির আবির্ভাবকাল ৫০০ খ্রিষ্টাব্দের আগে। তিনিও প্রয়োজনবোধে বহু স্থানে মনুবচন উদ্ধৃত করেছেন। আবার অপরার্ক, কুল্লুক ভট্ট প্রভৃতি ভাষ্যকারগণও নিজ নিজ মন্তব্যের সমর্থনে বৃহস্পতির ওই উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন, কুল্লুক ভট্ট মনুসংহিতার প্রথম শ্লোকের টীকায় মনুবচনের প্রশংসাসূচক বৃহস্পতির দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে—

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং তু মনুস্মৃতৌ।
মন্বর্থবিপরীতা যা স্মৃতিঃ সা ন প্রশস্যতে॥

বেদের অর্থ ঠিক ঠিকভাবে উপস্থাপিত করার জন্যই মনুস্মৃতির প্রাধান্য। যে স্মৃতি মনুবচনের বিরুদ্ধ তা নিন্দনীয়।

আবার

তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।
ধর্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে॥

তর্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র ততক্ষণ পর্যন্তই শোভা পায়, যতক্ষণ মনুস্মৃতি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকে। মনু হলেন ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষের উপদেষ্টা।

বোঝা যাচ্ছে, মনুবচনই বেদবাক্য হিসেবে শিরোধার্য হয়ে আছে। বৈদিক ধর্মে মানবসমাজের সর্বক্ষেত্রে মনুসংহিতার অনুশাসনই চূড়ান্ত, এর অন্যথা হবার উপায় ছিল না। বস্তুত সভ্যতার নানান চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই বর্তমান যুগে এসেও সেই প্রাচীন মনুযুগের অনুশাসন থেকে এখনো যে মুক্ত হতে পারছি না আমরা, এটাই তিক্ত সত্য ও পরিতাপের বিষয়। এবং মানবতার কলঙ্কও।

উল্লেখ্য, মনুসংহিতার বিষয়বস্তু নানা ধারায় বিস্তারিত। বৈদিক ভাবপরম্পরাকে আশ্রয় করে মনুসংহিতা রচিত হয়েছে বলে প্রচার করা হলেও যে সময়ে এই গ্রন্থের জন্ম, সে সময়ের সমাজের দিকে দৃষ্টি রেখেও অনেক নতুন কথা এখানে বলা হয়েছে। ফলে মনুসংহিতায় বর্ণিত ব্রাহ্মণ প্রাধান্য, বর্ণভেদপ্রথা, বিবাহসম্পর্কীয় আলোচনা, নারীর স্বাতন্ত্র্য অননুমোদন, বর্ণ ও আশ্রম ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলো বেদসংহিতার কোথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকার কারণে বর্তমান যুগে এগুলো নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নইলে সুদীর্ঘকাল যাবৎ মনুবচনকেই বেদবাক্য শিরোধার্য করে ব্রাহ্মণ্যবাদ নামের যে অনৈতিক শাসন ব্যবস্থা এখনো নানারূপে চালু রয়েছে, তা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে না এবং সেক্ষেত্রে নারীকেও পুরুষের ভোগ্যবস্তুর অপমানকর অবস্থান থেকে মানবসত্তায় উন্নীত করা যাবে না আদৌ। তাই বর্তমান বিজ্ঞান-চেতনা ও জ্ঞানস্তরের সাপেক্ষে মনুশাস্ত্রের অমানবিক আবহে ভাগ্যাহত নারীর মানবেতর অবস্থান চিহ্নিত করার লক্ষ্যে মনুসংহিতার প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর ওপর মুক্তদৃষ্টি নিক্ষেপ জরুরি। কেননা, এর মাধ্যমেই পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট ও প্রচলিত ধর্মতত্ত্বগুলোরও প্রকৃত গন্তব্য ও মৌলিক প্রবণতাটা কী এবং নারী কেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনাটা কী তারও ধারণা পেতে সহায়ক হবে।

বর্ণাশ্রম, মানবতা হননের প্রথম ধর্মীয় আগ্রাসন

পুরুষতন্ত্রের সন্দেহাতীত ধারক ও বাহক হিসেবে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতার প্রায় শুরুতে অনিবার্যভাবেই জগৎসৃষ্টির হেতু পুরুষরূপী ব্রহ্মার অব্যক্ত স্বরূপের খোঁজ পেয়ে যাই আমরা—

যোহসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোহব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্বভূতময়োহচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥

যিনি মনোমাত্রাগ্রাহ্য, সূক্ষ্মতম, অপ্রকাশ, সনাতন (চিরস্থায়ী), সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ অর্থাৎ সর্বভূতে বিরাজমান এবং যিনি চিন্তার বহির্ভূত সেই অচিন্ত্য পুরুষ স্বয়ংই প্রথমে শরীরাকারে (মহৎ প্রভৃতিরূপে) প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। (১/৭)।

সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥

সেই পরমাত্মা স্বকীয় অব্যাকৃত (unmanifested) শরীর হতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করে চিন্তামাত্র প্রথম জলের সৃষ্টি করলেন এবং তাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ করলেন। (১/৮)।

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতমহঃ॥

জলনিক্ষিপ্ত সেই বীজ সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটি অণ্ডে পরিণত হলো আর সেই অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্ম পরিগ্রহ করলেন। (১/৯)।

এরপর পিতামহ ব্রহ্মা জগতের তাবৎ কিছু সৃষ্টি করতে লাগলেন। স্বর্গলোক, মর্ত্যলোক, আকাশ, অষ্টদিক, সমুদ্রাখ্য, দোষ, গুণ, মহত্ত, ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, বেদ, যজ্ঞ, শাস্ত্র, দেবাদি, অগ্নি, বায়ু, সূর্য, কাল, ক্ষণ, তপস্যা, বাক্য, রতি, কামনা, ক্রোধ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম, ফলাফল, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি লৌকিক-অলৌকিক যাবতীয় ভাব ও বস্তুনিচয় তৈরি করলেন। উল্লেখ্য, একক স্রষ্টায় বিশ্বাসী পৃথিবীর সবগুলো ধর্মতত্ত্বেই জগৎস্রষ্টার স্বরূপ ও সৃষ্টি সম্পর্কিত মৌলিক ধারণার মধ্যে সম্ভবত খুব একটা তফাৎ নেই। স্রষ্টার সর্বব্যাপ্ততা আর হও বললেই হয়ে যাওয়ার অকল্পনীয় ক্ষমতা না থাকলে তিনি স্রষ্টা হবেনই বা কী করে! অতএব দৃশ্যমান অদৃশ্যমান প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই সৃষ্টির বাকি থাকার কথা নয়। যেহেতু তিনি জগতের স্রষ্টা বা প্রভু বা পতি, তাই প্রজা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মা হবেন কী করে! অতএব এবার তিনি জীবজগৎ সৃষ্টিতে মনোযোগী হলেন—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোহভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভু॥

সেই প্রভু প্রজাপতি আপনার দেহকে দ্বিধা করে অর্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করলেন এবং তারপর সেই নারীর গর্ভে বিরাটকে উৎপাদন করলেন। (১/৩২)।

তপস্তপ্তাসৃজৎ যং তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ॥

হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করে স্বয়ং যাকে সৃষ্টি করলেন, আমি সেই মনু— আমাকে এই সমুদয়ের দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা বলে জেনো। (১/৩৩)।

অর্থাৎ ব্রহ্মা হচ্ছেন সর্বলোকপিতামহ, আর মনু হচ্ছেন জীবজগতের আদিপিতা। এবং তা যে নিশ্চিতভাবেই পুরুষবাচক তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রজাসৃষ্টির মানসে আদিপিতা মনু তপস্যা করে প্রথমত দশজন মহর্ষি প্রজাপতি সৃষ্টি করলেন (১/৩৪)। (এরাও কিন্তু পুরুষই।) এই মহাতেজস্বী দশজন মহর্ষির মাধ্যমে ধাপে ধাপে বিস্তর জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অসুর, নাগ, সর্প, সুপর্ণ এবং দেবলোক পিতৃলোক সবই সৃষ্টি হতে লাগল। এভাবেই মানুষ এবং যাবতীয় পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ ইতরপ্রাণী সব সৃষ্টি হতে লাগল। আর এসবের জন্ম-সৃষ্টির পেছনের কারণ হিসেবে জন্মান্তরবাদ নামের এক অদ্ভুত তত্ত্ব সৃষ্টি করে তারই যুক্তি দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো— যাকে বলে 'পূর্বজন্মের কর্মফল'। পূর্বজন্মের নিজ নিজ কৃতকর্মের ফলস্বরূপ অবিনাশী আত্মার পরজন্মে বিভিন্ন যোনিদেহপ্রাপ্তির এই সুচতুর ধারণা তথা জন্মান্তরবাদের অদৃশ্য নিগড়ে পরবর্তীকালের বৈদিক তথা ভারতীয় সমাজদেহ যে ভয়ঙ্কর পাঁকচক্রে বাঁধা পড়ে গেল, তা থেকে আর মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় নি আজো। কেননা পরমাত্মা ব্রহ্মার সৃষ্ট নিয়মেই এসব জন্ম-জন্মান্তরের অনিবার্য ধারাক্রম আবর্তিত হচ্ছে বলে বিশ্বাস করানো হয়। অবিনাশী আত্মার এই আবর্তন এমনই চিরায়ত ভয়াবহ আবর্তন যে জগতের প্রলয় বা ধ্বংস হলেও এ আবর্তন চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায় না। পরমেশ্বরের ইচ্ছারূপ কিছুকাল বিরতিমাত্র সম্ভব—

এবং সর্বং স সৃষ্ট্বেদং মাং চাচিন্ত্যপরাক্রমঃ।
আত্মনান্তর্দধে ভূয়ঃ কালং কালেন পীড়য়ন্॥

মহর্ষিগণ, সেই অচিন্ত্যপরাক্রম ভগবান এইভাবে স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় জগৎকে ও আমাকে সৃষ্টি করে প্রলয়কাল দ্বারা সৃষ্টিকালের বিনাশসাধন করত প্রলয়কালে পুনর্বার আপনাতেই আপনি অন্তর্হিত হন। (১/৫১)।

তস্মিন স্বপতি তু স্বস্থে কর্মাত্মানঃ শরীরিণঃ।
স্বকর্মভ্যো নিবর্তন্তে মনশ্চ গ্লানিমৃচ্ছতি॥

ভগবান প্রজাপতি যখন (জগতের প্রলয়কালে) আপনাতে আপনি অবস্থিত থেকে বিরাম উপভোগ করেন, অর্থাৎ দেহ-মনের ব্যাপার রহিত হন, তখন কার্যানুযায়ী-লব্ধদেহ শরীরিগণও স্ব স্ব কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয় এবং তাদের মনও সকল ইন্দ্রিয়ের সাথে লীনভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ কার্যরহিত হয়। (১/৫৩)।

এবং স জাগ্রৎস্বপ্নাভ্যাদিমং সর্বং চরাচরম্।
সঞ্জীবয়তি চাজস্রং প্রমাপয়তি চাব্যয়ঃ॥

এইরূপে সেই অব্যয় পুরুষ ব্রহ্মা স্বীয় জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থার দ্বারা এই চরাচর বিশ্বের সতত সৃষ্টি ও সংহার করছেন। (১/৫৭)।

ভারতীয় বৈদিক ধর্মে কর্মফল অনুবর্তী এই পরমার্থিক জন্মান্তরবাদের ধারণা বা দর্শন যে মূলত কুচক্রী ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকচক্রের সমাজ শাসনের এক ভয়াবহ সুচতুর শাসনতাত্ত্বিক ধর্মদর্শন তা মনুসংহিতার পরতে পরতে উৎকটভাবেই পরিদৃষ্ট হয়। কেননা কর্মফল অনুযায়ীই কেউ শাসক, কেউ শাসিত, কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ শূদ্র হয়ে জন্মেছে। এবং নারীজন্মও তার পূর্বজন্মের কর্মেরই ফল। এই কর্মফল এমনই অবিচ্ছেদ্য অপরিবর্তনীয় যে, এজন্মে কর্মনির্দিষ্ট কার্যাদি সুষ্ঠু ও যথাযথ সম্পাদনের মাধ্যমেই শুধু পরবর্তী জন্মে উত্তম ফল পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে। তাই এ জন্মের দুঃখকষ্ট যন্ত্রণাভোগ পূর্বজন্মের কোনো দুষ্কর্মের ফল

হওয়ায় এর জন্য নিজেই দায়ী এবং তা ভোগ করতেই হবে, অন্য কাউকে দোষী করার উপায় নেই। অন্য কেউ এজন্যে দায়ীও নয়। অন্যদিকে এ জন্মে যাবতীয় সুখ ভোগকারীর উপভোগ্য সকল সুবিধাও তার পূর্বজন্মের কোনো সুকৃতিরই পুরস্কার। সমাজের ধর্মীয় শাসনতন্ত্রকে এমন নিরাপদ সর্বগ্রাসী উপভোগ্য করে তোলার এই যে প্রক্রিয়া, তা যেন কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত বা শাসিতদের দিক থেকে কোনোরূপ হুমকির সম্মুখীন না হয়, সেজন্যে ব্রহ্মার নামে সুকৌশলে প্রচারিত জন্মান্তরবাদের এই ধারাক্রমে মানবজীবনটাকেও বেঁধে ফেলা হয়েছে এক ভয়ঙ্কর অমানবিক বর্ণাশ্রম প্রথায়—

লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ॥

পৃথিব্যাদির লোকসকলের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করলেন। (১/৩১)।

এই বর্ণ সৃষ্টি করেই থেমে যান নি। কেননা এমনি এমনি তা সৃষ্টি হয় নি। পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী এজন্মে তার ফল ভোগ করার নিমিত্তেই ব্রহ্মা কর্তৃক এই বর্ণসৃষ্টি। তাই শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুনির্দিষ্ট কার্যেরও ঘোষণা করা হলো—

সর্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহুরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্মাণ্যকল্পয়ৎ॥

এই সকল সৃষ্টির অর্থাৎ ত্রিভুবনের রক্ষার জন্য মহাতেজযুক্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজের মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ— এই চারটি অঙ্গ থেকে জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের পৃথক পৃথক কার্যের ব্যবস্থা করে দিলেন। (১/৮৭)।

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥

অধ্যাপন, স্বয়ং অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (উপহার বা দান-সামগ্রী গ্রহণ)— এই ছয়টি কাজ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দেশ করে দিলেন। (১/৮৮)।

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥

প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, নৃত্যগীতবনিতাদি-বিষয়ভোগে অনাসক্তি, এই কয়েকটি কাজ ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়গণের জন্য সংক্ষেপে নিরূপিত করলেন। (১/৮৯)।

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥

পশুদের রক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য (স্থলপথ ও জলপথ প্রভৃতির মাধ্যমে বস্তু আদান-প্রদান করে ধন উপার্জন), কুসীদ (বৃত্তিজীবিকা— টাকা সুদে খাটানো) এবং কৃষিকাজ— ব্রহ্মা কর্তৃক বৈশ্যদের জন্য নিরূপিত হলো। (১/৯০)।

অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য— এই তিনবর্ণের লোকেরা দ্বিজাতি; এঁরা নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে নিরত থেকে বেদ অধ্যয়ন করবেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণেরাই অধ্যাপনা করবেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুই বর্ণের পক্ষে অধ্যাপনা করা উচিত নয়— এটাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। (১০/১)।

এতমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

প্রভু ব্রহ্মা শূদ্রের জন্য একটি কাজই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন,— তা হলো কোনও অসূয়া অর্থাৎ নিন্দা না করে (অর্থাৎ অকপটভাবে) এই তিন বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষা করা। (১/৯১)।

উপর্যুক্ত শ্লোকগুলো থেকে আমরা এটা বুঝে যাই যে, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা গোটা বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন তো বটেই। তবে এই বিশ্ব-জগৎ সুষ্ঠুভাবে রক্ষাকল্পে তিনি আসলে কোনো মানুষ সৃষ্টি করেন নি। চারটি বর্ণ সৃষ্টি করলেন— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের আবার দুটো ভাগ— প্রথম তিনটি উচ্চবর্ণ, আর চতুর্থটি অর্থাৎ শূদ্র হচ্ছে নিম্নবর্ণ, যে কিনা উচ্চবর্ণীয়দের সেবাদাস। আবার ব্রাহ্মণ, যে কিনা কোনো শারীরিক শ্রমের সাথে কোনোভাবেই জড়িত নয়, সকল বর্ণের শীর্ষে। শুধু শীর্ষেই নয়, ক্ষমতার এতটাই কল্পনাতীত উচ্চ অবস্থানে অবস্থিত যে, জগতের সবকিছুর মালিক বা প্রভুও হচ্ছে ব্রাহ্মণ—

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥

ব্রহ্মার পবিত্রতম মুখ থেকে উৎপন্ন বলে, সকল বর্ণের আগে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হওয়ায়, এবং বেদসমূহ ব্রাহ্মণকর্তৃক রক্ষিত হওয়ার জন্য (বা বেদসমূহ ব্রাহ্মণেরাই পঠন-পাঠন করেন বলে)— ব্রাহ্মণই ধর্মের অনুশাসন অনুসারে এই সৃষ্ট জগতের একমাত্র প্রভু। (১/৯৩)।

সর্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোহর্হতি॥

জগতে যা কিছু ধনসম্পত্তি সে সমস্তই ব্রাহ্মণের নিজ ধনের তুল্য; অতএব সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তিরই প্রাপ্তির যোগ্য হয়েছেন। (১/১০০)।

স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্ ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ॥

ব্রাহ্মণ যে পরের অন্ন ভোজন করেন, পরকীয় বসন পরিধান করেন, পরের ধন গ্রহণ করে অন্যকে প্রদান করেন, সে সবকিছু ব্রাহ্মণের নিজেরই। কারণ, ব্রাহ্মণেরই আনৃশংস্য অর্থাৎ দয়া বা করুণাতেই অন্যান্য যাবতীয় লোক ভোজন-পরিধানাদি করতে পারছে। (১/১০১)।

অন্যদিকে শূদ্রজন্ম যে প্রকৃত অর্থেই দাসজন্ম, এ বিষয়টা যাতে কারো কাছে অস্পষ্ট না থাকে সেজন্যে মনুশাস্ত্রে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে—

শূদ্রং তু কারয়েদ্ দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা।
দাস্যায়ৈব হি সৃষ্টোহসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা॥

ক্রীত অর্থাৎ অন্নাদির দ্বারা প্রতিপালিত হোক্ বা অক্রীতই হোক্ শূদ্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ দাসত্বের কাজ করিয়ে নেবেন। যেহেতু, বিধাতা শূদ্রকে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। (৮/৪১৩)।

এখানেই শেষ নয়। কেউ সন্তুষ্ট বা দয়াপরবশ হয়ে যদি শূদ্রকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চায়, এটাও খুবই গর্হিতকর্ম হবে। তাই এ কাজ সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে শাস্ত্রে—

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোহপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি॥

প্রভু শূদ্রকে দাসত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেও শূদ্র দাসত্ব কর্ম থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। দাসত্বকর্ম তার স্বভাবসিদ্ধ কর্ম (অর্থাৎ জন্মের সাথে আগত)। তাই ঐ শূদ্রের কাছ থেকে কে দাসত্ব কর্ম সরিয়ে নিতে পারে? (৮/৪১৪)।

তাই

বৈশ্যশূদ্রৌ প্রযত্নেন স্বানি কর্মাণি কারয়েৎ।
তৌ হি চ্যুতৌ স্বকর্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ॥

রাজা বিশেষ যত্ন সহকারে বৈশ্য এবং শূদ্রকে দিয়ে তাদের কাজ অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদি করিয়ে নেবেন। কারণ, তারা নিজ নিজ কাজ ত্যাগ করলে এই পৃথিবীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলবে। (৮/৪১৮)।

উচ্চবর্ণীয়দের জন্য প্রতিকূল সময়ে ভিন্ন জীবিকা গ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ এই মনুসংহিতায় বিশদভাবে দেয়া হলেও শূদ্রকে তার নিজ কর্মের বাইরে বিকল্প জীবিকা গ্রহণের কোনো সুযোগই দেয়া হয় নি। এমনকি মনুশাস্ত্রে শূদ্রের কোনোরূপ সম্পদ অর্জনকেও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে—

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥

ধন অর্জনে সমর্থ হলেও শূদ্রকে কিছুতেই ধন সঞ্চয় করতে দেয়া চলবে না, কেননা ধন সঞ্চয় করলে ব্রাহ্মণদের কষ্ট হয়। শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হয়ে ব্রাহ্মণদের পরিচর্যা না করে অবমাননা করতে পারে। (১০/১২৯)।

তারপরও কোনো শূদ্র যদি কদাচিৎ ধন আহরণ করে ফেলে? সেক্ষেত্রেও ধর্মের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানোর কোনো উপায় নেই তার। কেননা—

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ দ্রব্যো দাদানমাচরেৎ।
ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃহার্যধনো হি সঃ॥

ব্রাহ্মণ নিঃসঙ্কোচে শূদ্রের জিনিস গ্রহণ করবেন; কারণ তার অর্থাৎ শূদ্রের নিজের বলতে কোনো ধনও নেই, সেও প্রভুরই জন্য দ্রব্য আহরণ করে; সে স্বয়ং ধনহীন। (৮/৪১৭)।

শূদ্রের এই ভয়াবহ শূদ্রত্বের কারণ কী? সেই পূর্বজন্মেরই কর্মফল এটা। এই কর্মফলের কারণেই এই মানবেতর অবস্থা উত্তরণে এ জন্মে তার মুক্ত জীবনধারী অর্থাৎ দ্বিজ হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিজত্ব হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদের সেই বর্ণবাদী প্রতারণা, যার মাধ্যমে

সমাজকে স্পষ্টতই বহু বিভাজনে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয়েছে। দ্বিজ অর্থ হচ্ছে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করেন যিনি। এই দ্বিতীয় জন্ম একটি আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও বর্ণবিভাজিত সমাজে এর প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এই দ্বিজ হয়ে ওঠাই বৈদিক বর্ণপ্রথার গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট। এর মাধ্যমেই অবধারিতভাবে সমাজের জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভু ও ভৃত্য বা দাসের বাধ্যতামূলক বিভক্তিকরণ বর্ণ বা বংশপরম্পরা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্রহ্মা কর্তৃক নির্ধারিত চারটি বর্ণের মধ্যে প্রথম তিনটি বর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বিজ হয়ে ওঠার সুযোগ ও অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ এরা প্রভু বা প্রভুসম্পর্কিত জাতি—

নাভিব্যাহারয়েদ্ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্বেদে ন জায়তে॥

মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়নের পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ যতক্ষণ না বেদজন্মরূপ উপনয়ন প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ) স্বধা অর্থাৎ শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র ছাড়া অন্য বেদবাক্য উচ্চারণ করাবে না (এটি পিতার প্রতি উপদেশ)। যতক্ষণ না উপনীত হয়ে বেদাধ্যয়ন দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করবে, ততক্ষণ (ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ) শূদ্রেরই সমান। (২/১৭২)।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে উপনয়ন সংস্কারের বিধান থাকায় এরা 'দ্বিজাতি' নামে অভিহিত হয়। আর চতুর্থ বর্ণ শূদ্র উপনয়নসংস্কার বিহীন হওয়ায় দ্বিজাতি নয়, তারা হলো 'একজাতি'। এছাড়া পঞ্চম কোনও বর্ণ নেই অর্থাৎ ঐ চারটি বর্ণের অতিরিক্ত যারা আছে তারা সকলেই সঙ্করজাতি। (১০/৪)।

এই সংকরজাতিরা ব্রহ্মাসৃষ্ট চতুর্বর্ণেরও বাইরে। অর্থাৎ এদের থেকেই অস্পৃশ্য বা অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। উত্তর-ভারতীয় ভাষায় যাকে বলে দলিত সম্প্রদায়। এরাই বৈদিক সমাজের ব্রাত্য জনগোষ্ঠী।

বৈদিক শাস্ত্রে নারীর অবস্থান নির্ণয়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই এই দ্বিজত্বপ্রাপ্তির বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত চার জাতীয় মানুষই হলো চারটি বর্ণ। (এদের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই শীর্ষে অবস্থান করে সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পাবে। আর শূদ্র হচ্ছে সর্বনিম্ন অবস্থানে, যার প্রত্যক্ষ যোগ হচ্ছে দাসত্ব।) এ ছাড়া বর্বর, কৈবর্ত প্রভৃতি অন্যান্য যে সব মানুষ আছে তারা সংকীর্ণযোনি বা বর্ণসংকর (১০/৬-২৭)। চারটি বর্ণের মধ্যে ঊর্ধ্বতন তিনটি বর্ণ 'দ্বিজাতি' অর্থাৎ এদের দুবার জন্ম হয়; কারণ দ্বিতীয়-জন্ম উৎপাদক উপনয়ন-সংস্কার কেবল ঐ তিনটি বর্ণের পক্ষেই শাস্ত্রমধ্যে বিহিত আছে। শূদ্র হলো একজাতি অর্থাৎ ওদের একবার মাত্র জাতি বা জন্ম হয়, কারণ শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন-সংস্কারের বিধান নেই। অতএব অনিবার্যভাবে শূদ্ররা হলো নিম্নবর্ণীয় দাস। ফলে এরা ব্রত যজ্ঞ অনুষ্ঠানাদি পালনের যোগ্য হতে পারে না। কারণ এই জাত-কর্মাদির অধিকার কেবল দ্বিজদেরই আয়ত্তে। একইভাবে যেহেতু এই শাস্ত্রসূত্রানুসারেই নারীর জন্যেও দ্বিজ হবার কোনো অধিকার রাখা হয় নি, তাই নারীও শূদ্রসমতুল্য বা শূদ্রই—

অমন্ত্রিকা তু কার্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্॥

পুরুষের মতো স্ত্রীলোকদেরও শরীরসংস্কার বা দেহশুদ্ধির জন্য এই সমস্ত আবৃৎ (অর্থাৎ জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে সংস্কারগুলির আনুষ্ঠানিক কর্মসমূহ) যথা-নির্দিষ্ট কালে এবং যথানির্দিষ্ট ক্রমে সম্পন্ন করতে হয়; কিন্তু তাদের পক্ষে ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে কোনও মন্ত্রের প্রয়োগ থাকবে না। (২/৬৬)।

সংস্কার মানে হচ্ছে শুদ্ধ হওয়া। এর জন্যে অবশ্যই মন্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী মন্ত্রহীন সংস্কার অর্থহীন, ফলহীন। নারীর জন্য মন্ত্রের প্রয়োগ না থাকার অর্থ হলো কিছু অর্থহীন ফালতু সংস্কার আরোপ করা হলেও মূলত নারীর উপনয়ন-সংস্কার হয় না। কেননা ওই সংস্কারকর্ম কোনো ধর্মানুষ্ঠানই নয়। এর অর্থ দাঁড়ায়, দ্বিজ হওয়া নারীর পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। ফলে মূলত মনুশাস্ত্রে কোথাও নারীকে শূদ্রের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। স্মৃতি বা বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে বা কোনো ধর্মানুষ্ঠানে শূদ্রকে যেমন কোনো অধিকার দেয়া হয় নি, নারীকেও তেমনি স্বভাবজাত দাসী বানিয়েই রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে যাতে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ না থাকে সেজন্যে মনুশাস্ত্রে সুস্পষ্ট বিধান জুড়ে দেয়া হয়েছে—

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ॥

স্ত্রীলোকদের মন্ত্রপাঠপূর্বক জাতকর্মাদি কোনও ক্রিয়া করার অধিকার নেই— এ-ই হলো ধর্মব্যবস্থা। অর্থাৎ স্মৃতি বা বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে এবং কোনও মন্ত্রেও এদের অধিকার নেই— এজন্য এরা মিথ্যা বা অপদার্থ,— এই হলো শাস্ত্রস্থিতি। (৯/১৮)।

তবে যত মিথ্যা-অপদার্থই হোক না কেন, পুরুষের অনিবার্য প্রয়োজনেই গোটা মনুশাস্ত্রে নারীর জন্য একটি সংস্কারকে সবার ওপরে স্থান দিয়ে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও অবধারিত করে দেয়া হয়েছে— তা হলো বিবাহ-সংস্কার। এ ব্যাপারে মনুসংহিতার স্পষ্টোক্তি—

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥

বিবাহ-সংস্কারই স্ত্রীলোকদের উপনয়নস্থানীয় বৈদিক সংস্কার (অর্থাৎ বিবাহের দ্বারাই স্ত্রীলোকদের উপনয়ন সংস্কার সিদ্ধ হয়); বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা যে তাদের পতিদের সেবা করে (শুশ্রূষা বা সন্তোষ বিধান করে), তা-ই তাদের গুরুগৃহে বাসস্বরূপ (গুরুগৃহে বাস করা অবস্থায় বেদাধ্যয়ন কর্তব্য, কিন্তু স্ত্রীলোক তো সত্য-সত্য গুরুগৃহে বাস করে না, তাই তাদের বেদাধ্যয়নের প্রসঙ্গ আসে না); স্বামীর গৃহস্থালির কাজই হলো (যেমন, অন্নরন্ধন, পোশাকাদি সাজিয়ে রাখা, টাকাকড়ি গুণে ঠিকমতো রাখা ইত্যাদি) স্ত্রীলোকেদের পক্ষে গুরুগৃহে (সায়ং ও প্রাতঃকালীন হোমরূপ) অগ্নিপরিচর্যা [ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে থেকে সায়ং-প্রাতঃকালীন যে সমিৎ সংগ্রহ করে, তা স্ত্রীলোকদের পক্ষে গৃহস্থালির কাজের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আর স্ত্রীলোকেরা গৃহস্থালির কাজকর্ম অর্থাৎ অগ্নির দ্বারা নিষ্পাদনীয় রন্ধনাদি যে সব কাজ করে, তার দ্বারা ব্রহ্মচারীর করণীয় যত কিছু যম-নিয়ম প্রভৃতি সেগুলিও পদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। অতএব, এখানে স্ত্রীলোকদের অগ্নিপরিক্রিয়াটি পুরুষদের যম-নিয়মাদি কর্তব্যগুলির উপলক্ষণ]। (২/৬৭)।

অর্থাৎ এক কথায় এটা এমনই এক শাস্ত্রীয় প্রবঞ্চনা, যার মাধ্যমে খুব সচেতনভাবে নারীকে সমস্ত বৈদিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে পুরুষের অনুগামী অধীনস্থ হওয়াই নিয়তি-নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

অনুগত ক্রীতদাসের প্রতিও ন্যূনতম যেটুকু মানবিক সহানুভূতি অন্তত মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তিতে থাকা উচিত বলে মনে হয়, গোটা মনুশাস্ত্রে শূদ্রদের জন্য এর ছিটেফোঁটাও কোথাও দেখা যায় না। এবং নারীর ক্ষেত্রে এই মনেবৃত্তি এতটাই আপত্তিকর পর্যায়ে নেমে গেছে যে, নারী যে বস্তুত কোনো মানুষ বা মানবিক সত্তাধারী কোনো প্রাণী মনুশাস্ত্র তা-ও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত বলে মনে হয়। মনুসংহিতা তো আর যে সে গ্রন্থ বা শাস্ত্র নয়, খোদ বেদাশ্রিত ধর্মশাস্ত্র—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্মো মনুনা পরিকীর্তিতঃ।
স সর্বোঽভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

ভগবান মনু যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও (যেমন, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম, সংস্কারধর্ম প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণাদি বিশেষ বিশেষ বর্ণের জন্য বিহিত বিশেষ বিশেষ ধর্ম) উপদেশ দিয়েছেন, সে সবগুলিই বেদে প্রতিপাদিত হয়েছে। কারণ, সেই বেদ হলো সকল প্রকার জ্ঞানের আকর (অর্থাৎ জ্ঞাপক কারণ)। (২/৭)।

তাই মনুর শাস্ত্র মনুসংহিতা অনিবার্য ও অবশ্যপালনীয় জীবনবিধান, যার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো উপায় বৈদিক সমাজধর্মে কোথাও রাখা হয় নি। ফলে মনুসংহিতায় নারীর জন্যে আরোপিত বিধান বা অনুশাসনগুলিও যে আচরিত সমাজ ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক ছিল তা নতুন করে বলা বাহুল্য। অতএব প্রশ্ন আসে, মনুশাস্ত্রে নারী আসলে কী বস্তু?

মনুসংহিতায় নারী

এক কথায় বলতে হলে, মনুশাস্ত্রে নারী হচ্ছে পুরুষের ইচ্ছাধীন কর্ষণযোগ্য ক্ষেত্র বা জৈবযন্ত্র, যাতে পুরুষপ্রভু তার বীর্যরূপ বীজ বপন করে পুত্ররূপ শস্য হিসেবে যোগ্য উত্তরাধিকারী উৎপাদনের মাধ্যমে ধর্মরূপ পুরুষতন্ত্রের বহমান ধারাটিকে সচল রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। এখানে নারী কেবলই এক পুরুষোপভোগ্য জৈবসত্তা। নারীর মনস্তত্ত্ব বা কোনোরূপ মানসিক সত্তাকে মনুশাস্ত্রে স্বীকারই করা হয় নি। নারীর দেহসত্তাটিরই প্রাধান্য এখানে, যার মালিকানাও নারীর নিজের নয় অবশ্যই। এর মালিকানা শুধুই আধিপত্যকামী পুরুষ প্রভুর। পুরুষতন্ত্র তার ইচ্ছানুরূপ শারীরিক-মানসিক ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করতে, সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং তার নিরঙ্কুশ আধিপত্যবাদ কায়েম রাখতে যখন যা করার প্রয়োজন মনে করেছে, ধর্মশাস্ত্রের নাম দিয়ে মনুশাস্ত্রে তার সবই প্রয়োগ করা হয়েছে। কোনো কিছুই বাদ রাখা হয় নি। সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের অনুকূলে প্রয়োজনীয় আইন ও অনুশাসন সৃষ্টির মাধ্যমে নারীকে বাধ্য করেছে সম্পূর্ণ পদানত রাখতে। এমনকি নারীভোগকে আরো উপভোগ্য করে নিংড়ে নেয়ার প্রয়োজনে নারীর মনস্তাত্ত্বিক যে বিমূর্ত জগৎ যেখানে আইনের শাসনও পৌঁছাতে পারে না, সেখানেও আধিপত্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও ফাঁপা প্রশংসা বা কল্পিত গুণ-গান করে তাকে সুযোগমতো প্রতারণা করতেও দ্বিধা করা হয় নি।

তাই পুনরুক্তি হলেও এখানে যে বিষয়টা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার, মনুশাস্ত্রের বর্ণভিত্তিক সমাজে দ্বিজ না হওয়ার কারণে বর্ণদাস শূদ্রের যেমন নিজের মালিকানাও নিজের থাকে না, প্রভুর অধীন সে, তেমনি নারীও স্পষ্টভাবে পুরুষপ্রভুরই অধীন। সাধারণ শূদ্রের ক্ষেত্রে সে হয়ত জন্মসূত্রে শ্রমদাস হয়ে জন্মানোর কারণে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সেবাদাস হয়ে আমৃত্যু শ্রমসেবা দিয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু মনুশাস্ত্রের নারীর অবস্থা আরো শোচনীয়। জন্মসূত্রে শূদ্রতুল্য হওয়ায় ভিন্নভাবে একই নিয়তি তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হলেও জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নারীদেহটির কারণে তাকে শ্রমসেবার পাশাপাশি ইচ্ছেরহিত এক ভয়ঙ্কর

দেহমূল্যও দিয়ে যেতে হয়। এক্ষেত্রে নারী শূদ্রের চেয়েও অধমই বলা যায়। আরেকটু এগুলেই আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে, সর্বজ্ঞ মনুশাস্ত্রে নারীকে কীভাবে বিশেষিত করা হয়েছে।

পুরুষের কর্ষণযোগ্য শস্যক্ষেত্র নারী

নারী হচ্ছে পুরুষের মালিকানাধীন ও ইচ্ছাধীন কর্ষণযোগ্য শস্যক্ষেত্র, এটাই নারীর প্রতি ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সিদ্ধান্তও। এই সিদ্ধান্ত নিরাপদে অটল রাখার প্রয়োজনেই গোটা মনুসংহিতায় নারী বিষয়ক যাবতীয় অনুশাসন একই দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুগামী হয়েছে বলা যায়।

ক্ষেত্রভূতা স্মৃতা নারী বীজভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্।
ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্বদেহিনাম্॥

নারী শস্যক্ষেত্রের মতো, আর পুরুষ শস্যের বীজস্বরূপ। এই ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগে সকল প্রাণীর উৎপত্তি। (৯/৩৩)।

বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে।
সর্বভূত প্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতা॥

বীজ এবং যোনি এই দুটির মধ্যে বীজই শ্রেষ্ঠ বলে কথিত হয়। কারণ, সর্বত্র সন্তান বীজের লক্ষণ যুক্ত হয়ে থাকে। (৯/৩৪)।

এখানে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত। যেহেতু আদিম কৃষিভিত্তিক সমাজকৃষ্টিতে নারীকে পুরুষের শস্যক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তাই পুরুষ তার নিজস্ব শস্যক্ষেত্রে ইচ্ছে-স্বাধীন কর্ষণ করে প্রয়োজনীয় বীজ বপন করে পছন্দসই ফসল তুলে নেবে এটাই স্বাভাবিক। এবং ক্ষেত্রের মালিক যেহেতু পুরুষই, তাই ফসলের মালিকও পুরুষ প্রভুই হবে এটাও শিরোধার্য। তবে বিশেষ ধরনের সম্পদের মোহনীয় উপস্থিতি যেখানে স্পষ্ট, সেখানে মালিকানা দ্বন্দ্বেরও যে ক্রমবিকাশ ঘটে তার ইঙ্গিতও মনুসংহিতায় অস্পষ্ট নয়—

নশ্যতীষুর্যথা বিদ্ধঃ খে বিদ্ধমনুবিধ্যতঃ।
তথা নশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং বীজং পরপরিগ্রহে॥

যেমন অন্যের শরে বিদ্ধ কৃষ্ণশারাদি প্রাণীর শরীরে ঐ বেধজনিত ছিদ্রে অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণ নিষ্ফল হয়, এবং ঐ মৃগ প্রথম বাণনিক্ষেপকারী পুরুষেরই প্রাপ্য হয়; সেইরকম পরস্ত্রীতে নিক্ষিপ্ত বীজও বীজী পুরুষটির নষ্ট হয়ে যায়, যেহেতু তা থেকে উৎপন্ন সন্তানটি হয় ক্ষেত্রস্বামীর। (৯/৪৩)।

অর্থাৎ ব্যভিচারী প্রভাবশালী পুরুষদের মধ্যে নারীরূপ ক্ষেত্র দখল ও ভোগের যে স্বেচ্ছাচারিতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজদেহে প্রচলিত ছিল এবং তার ফসল হিসেবে সন্তান সৃষ্টি ও তার মালিকানাজনিত জটিলতায় সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্টের উপর্যপুরি সম্ভাবনাও যে প্রকট হয়ে উঠছিল তা বুঝাই যায়। এই উদ্ভুত বিশৃঙ্খলা নিরসন করার প্রয়োজনেই সন্তানের মালিক চিহ্নিত করা জরুরি হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে নারী যার মালিকানায়ই থাকুক না কেন তা যে লোভনীয় ও ভোগ্য এবং তা ভোগ করার ক্ষেত্রে চিরায়ত পুরুষশ্রেষ্ঠের জন্য কোথাও কিঞ্চিৎ অনৈতকতাদোষ থাকলেও তা যে অবৈধ নয়, তা-ই আসলে পরোক্ষভাবে অনুমোদন করা হয়েছে এখানে। অর্থাৎ নারীমাত্রেই পুরুষভোগ্যা। এখানে দ্বন্দ্ব নারীর নয়, কেননা পুরুষ ভিন্ন তার স্বকীয় কোনো অস্তিত্ব থাকার কথাও নয়। যেহেতু এই দ্বন্দ্ব পুরুষের সাথে পুরুষের, একজন পুরুষের বৈধ মালিকানার নারীতে যাতে অন্য কেউ পুরুষশ্রেষ্ঠতার প্রভাব নিয়ে ভোগের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে না পড়ে সে লক্ষ্যে মনুশাস্ত্রে প্রভাবশালী পুরুষগণকে অতি উদার ও নমনীয়ভাবে কাল্পনিক অতীত গাথার প্রসঙ্গ টেনে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা লক্ষ করা যায়—

অত্র গাথা বায়ুগীতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
যথা বীজং ন বপ্তব্যং পুংসা পরপরিগ্রহে॥

পরস্ত্রীতে বীজ বপন করা পুরুষের যে উচিত নয় সে সম্বন্ধে অতীতকালজ্ঞ পণ্ডিতেরা বায়ুকথিত কতকগুলি গাথা অর্থাৎ ছন্দোবিশেষযুক্ত বাক্য বলে গিয়েছেন। (৯/৪২)।

অন্যদুপ্তং জাতমন্যদিত্যেতন্নোপপদ্যতে।
উপ্যতে যদ্ধি যদ্বীজং তত্তদেব প্ররোহতি॥

একরকম বীজ বপন করা হলো আর অন্য রকম শস্য জন্মালো, এরকমটি হতে পারে না; কিন্তু যেমন বীজ বপন করা হয় সেইরকমই ফসল তা থেকে জন্মায়। (৯/৪০)।

তৎ প্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিনা।
আয়ুষ্কামেণ বপ্তব্যং না জাতু পরযোষিতি॥

অতএব বীজ যখন ঐ রকম প্রভাবসম্পন্ন, তখন প্রাজ্ঞ (যিনি স্বাভাবিক প্রজ্ঞার দ্বারা যুক্ত), বিনীত অর্থাৎ শিক্ষিত, জ্ঞানে (অর্থাৎ বেদাঙ্গশাস্ত্রে) এবং বিজ্ঞানে (অর্থাৎ তর্ক-কলা প্রভৃতি-বিষয়ক শাস্ত্রে) অভিজ্ঞ এবং আয়ুষ্কামী ব্যক্তি নিজশরীরস্থিত ঐ বীজ কখনো যেন পরক্ষেত্রে অর্থাৎ পরস্ত্রীতে বপন না করেন। (৯/৪১)।

যাদৃশং তূপ্যতে বীজং ক্ষেত্রে কালোপপাদিতে।
তাদৃগ্ রোহতি তত্তস্মিন্ বীজং স্বৈর্য্যঞ্জিতং গুণৈঃ॥

বপনের উপযুক্ত বর্ষাকাল প্রভৃতি সময়ে উত্তমরূপে কর্ষণ-সমীকরণ প্রভৃতি পদ্ধতির দ্বারা সংস্কৃত ক্ষেত্রে যেরকম বীজ বপন করা হয়, সেই প্রকার ক্ষেত্রে সেই বীজ বর্ণ-অবয়বসন্নিবেশ রস-বীর্য প্রভৃতি নিজগুণের দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে শস্যরূপে উৎপন্ন হয়। (৯/৩৬)।

অতএব এই ভয়ঙ্কর সত্যটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মনুর ধর্মীয় দৃষ্টিতে ক্ষেত্রস্বরূপা নারী প্রকৃত অর্থেই জড়স্বভাবী পরাধীন সত্তা। কে কখন কীভাবে কোথায় তার উপভোগ্য নারীদেহটিকে নানারূপে নানাভাবে কর্ষণ বা ভোগ করল, তা ওই নারীর দেখার বিষয় নয়; এ অধিকারও তার নেই। কারণ—

প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
গর্ভধারণের জন্য নারী এবং গর্ভাধানের জন্য পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে। (১০/৯৬)।

নারীদেহ যতই ভোগ্যপণ্য হোক, তবু পুরুষের মোক্ষলাভ তথা জন্মান্তরবাদী দৃষ্টিতে ইহলৌকিক-পারলৌকিক মুক্তি ও আধিপত্য অর্জনের লক্ষ্যে ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী এই নারীদেহে পুত্র উৎপাদনই যেহেতু পুরুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য, তাই পছন্দসই পুত্র উৎপাদনার্থে তার একান্ত মালিকানাধীন স্ত্রী হিসেবে ভোগ্য ও যোগ্য নারীটি বাছাইয়ের দায়িত্বও পুরুষের ওপরই বর্তায়। এক্ষেত্রেও পুরুষতন্ত্রের চাপানো অনুশাসনে নারীকে সম্পূর্ণ পরাধীন ও বাসনারহিত চেতনবস্তু হিসেবেই দেখানো হয়েছে।

পুরুষের স্ত্রী-সংগ্রহে নারীর যোগ্যতা

মনুশাস্ত্রের ভোগবাদী দৃষ্টিতে নারী যেহেতু শস্যক্ষেত্রস্বরূপ, তাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুরুষেচ্ছায় সন্তোষ প্রদানক্ষম দেহের যোগ্যতা দিয়েই নারীর যোগ্যতা নির্ণিত হয়। এর সাথে ক্ষমতার উত্তরাধিকারের মূর্ত প্রতীক পুত্র উৎপাদন সক্ষমতা জড়িত থাকার বিষয় তো রয়েছেই। তাই পুরুষদেরকে পুত্র উৎপাদনে সক্ষম জননোপযোগী কন্যা নির্বাচনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে অবশ্যই তা ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে—

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে॥

যে নারী মাতার সপিণ্ড না হয় (অর্থাৎ সাতপুরুষ পর্যন্ত মাতামহবংশজাত না হয় এবং মাতামহের চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত সগোত্রা না হয়) এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয় (অর্থাৎ পিতৃস্বসাদিব সন্তান সম্ভব সম্বন্ধ না হয়) এমন স্ত্রী-ই দ্বিজাতিদের (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) পক্ষে ভার্যাত্বসম্পাদক বিবাহব্যাপারে এবং মৈথুন বা জনন কাজে বিধেয়। (৩/৫)।

মাতামহ বা পিতামহের বংশজাত হলেই কি নারীর সাথে মৈথুনজনিত শারীরিক ক্রিয়ায় কোনো সমস্যা হবার কথা? মোটেও তা নয়। তবু মৈথুন কাজটিকে গুরুত্ব দেয়ার কারণ নিশ্চয়ই মৈথুনকর্মে সৃষ্ট সন্তান জন্মদানের প্রসঙ্গেই বিবেচিত হয়েছে। স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের লক্ষ্যে এই কন্যা নির্বাচন জনন-উপযোগী হলেও যাতে উত্তরাধিকার মনোনয়নে সন্তানের বংশগতির ধারাটি নিরুপদ্রব থাকে, তারই গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে এখানে। আবার কোনো অর্থনৈতিক সুবিধা অস্বীকার করে হলেও এই বংশধারা সুস্থ-সাবলীল রাখার তাগিদেই হয়ত ঘোষিত হয়েছে—

মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোহজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ॥

বক্ষ্যমাণ দশটি কুল (বংশ বা পরিবার) গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশু এবং ধন ও ধান্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হলেও স্ত্রীসম্বন্ধ-ব্যাপারে সেগুলি বর্জনীয়। (৩/৬)।

এই দশটি কুল কী?—

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্চিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥

(এই কুলগুলি হলো—) যে বংশ ক্রিয়াহীন (অর্থাৎ যে বংশের লোকেরা জাতকর্মাদি সংস্কার এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদি নিত্যক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান করে না), যে বংশে পুরুষ সন্তান জন্মায় না (অর্থাৎ কেবল স্ত্রীসন্তানই প্রসূত হয়), যে বংশ নিশ্ছন্দ অর্থাৎ বেদাধ্যয়নরহিত, যে বংশের লোকেরা লোমশ (অর্থাৎ যাদের হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গে বড় বড় লোম দেখা যায়), যে বংশের লোকেরা অর্শ অর্থাৎ মলদ্বারাশ্রিত রোগ বিশেষের দ্বারা আক্রান্ত, যে বংশের লোকেরা ক্ষয়রোগগ্রস্ত, যে বংশের লোকেরা আময়াবী (আমাশয়রোগাক্রান্ত বা মন্দাগ্নি অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য যাদের ঠিকমতো পরিপাক হয় না), যে বংশের লোকেদের অপস্মার রোগ (যে রোগ স্মৃতিভ্রংশ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৈকল্য ঘটায়) আছে, যে বংশের লোকদের শ্বেতরোগ আছে এবং যারা কুষ্ঠরোগদ্বারা আক্রান্ত। এই দশটি বংশের কন্যাকে বিবাহ করা চলবে না। (৩/৭)।

অর্থাৎ এই সব বংশে বিবাহ করলে বিবাহোত্তরকালে উৎপন্ন সন্তানও সেই সেই রোগাক্রান্ত হতে পারে বলে বংশগতি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থেকে ঐসব পরিবারে বা বংশে বিবাহে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। কিন্তু যে বংশে কেবল কন্যাসন্তানই

জন্মে সে বংশে বিবাহে নিষেধাজ্ঞা আরোপের অর্থ কি কেবলই কন্যাসন্তান জন্মানোটা একটা ভয়ঙ্কর রোগ হিসেবে চিহ্নিত? না কি সামাজিক অপরাধ? তবে এই নিষেধাজ্ঞা থেকে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে খুব স্পষ্টভাবেই একটা নির্দেশনা পাওয়া যায় বৈ কি।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের স্ত্রী নির্বাচনে নারীর যোগ্যতাকে রীতিমতো ব্যক্তিগত বা শারীরিকভাবেই আক্রমণ করা হয়েছে—

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥

কপিলা কন্যাকে (যার কেশসমূহ তামাটে, কিংবা কণকবর্ণ) বিবাহ করবে না; যে কন্যার অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ আছে (যেমন, হাতে বা পায়ে ছয়টি আঙ্গুল আছে), যে নারী নানা রোগগ্রস্তা বা চিররোগিণী বা দুষ্প্রতিকার্য ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত, যে কেশশূন্যা (অথবা যে নারীর বাহুমূলে ও জঙ্ঘামূলে মোটেই লোম নেই, সে অলোমিকা), যার শরীরে লোমের আধিক্য দেখা যায়, যে নারী বাচাল (অর্থাৎ অতিপ্রগল্‌ভা) এবং যে নারীর চোখ পিঙ্গলবর্ণের— এই সমস্ত নারীকে বিবাহ করবে না। (৩/৮)।

নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্বতনামিকাম্।
ই পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং না চ ভীষণনামিকাম্॥

ঋক্ষ অর্থাৎ নক্ষত্রবাচক নামযুক্তা (যেমন, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা প্রভৃতি), বৃক্ষবাচক নামযুক্তা (যেমন, শিংশপা, আমলকী প্রভৃতি), নদীবাচক শব্দ যার নাম (যেমন, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি), অন্ত্যনামিকা অর্থাৎ অন্ত্যজজাতিবোধক নামযুক্তা (যেমন, বর্বরী, শর্বরী প্রভৃতি), পর্বতবাচক নামযুক্তা (যেমন, বিন্ধ্যা, মলয়া প্রভৃতি), পক্ষিবাচক নামযুক্তা (যেমন, শুকী, সারিকা প্রভৃতি), সাপবোধক নামযুক্তা (যেমন, ব্যালী, ভুজঙ্গী প্রভৃতি), ভৃত্যবাচক নামযুক্তা (যেমন, দাসী, চেটী প্রভৃতি) কন্যাকে এবং (ডাকিনী, রাক্ষসী প্রভৃতি) ভয়বোধক যাদের নাম এমন কন্যাকে বিবাহ করবে না। (৩/৯)।

অর্থাৎ নারীর নামের মধ্যেও পুরুষের মনোরঞ্জনের উপাদান থাকা বাধ্যতামূলক। যেহেতু নারীর গোটা সত্তাই পুরুষের ভোগের নিমিত্তে ব্রহ্মাকর্তৃক মর্ত্যলোকে পাঠানো হয়েছে, অতএব পুরুষকে সন্তোষ প্রদানই নারীর একমাত্র কাজ। তাই পুরুষের ভোগ্যসামগ্রী হিসেবে স্ত্রীলোকের একটি সুন্দর নাম যে তাকে ভোগের ক্ষেত্রেও মানসিক পরিতৃপ্তিজনক পরিস্থিতি বা আবহ তৈরি করে, সে বিবেচনাতেই হয়ত স্ত্রী-জাতির নামকরণে মনুর নির্দেশনা—

স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরম্।
মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্বাদাভিধানবৎ॥

স্ত্রীলোকদের পক্ষে এমন নাম রাখতে হবে— যে নাম সুখে উচ্চারণ করতে পারা যায় অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও বালকেরাও যে নাম অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারে (যেমন যশোদাদেবী; এই নাম দুরুচ্চারণাক্ষরহীন হবে, যেমন 'সুশ্লিষ্টাঙ্গী' এই রকম নাম হবে না), সে নাম যেন ক্রূরার্থের প্রকাশক না হয় (অর্থাৎ ডাকিনী, পরুষা প্রভৃতি নাম হবে না), যে নাম বিস্পষ্টার্থ হবে (অর্থাৎ অনায়াসে যে নামের অর্থবোধ হয়; 'কামনিধা', 'কারীষগন্ধী' প্রভৃতি, যে সব নামের অর্থ স্পষ্ট নয় এমন নাম হবে না), যে নাম হবে মনোহর অর্থাৎ চিত্তের আহ্লাদজনক (যেমন শ্রেয়সী; কিন্তু 'কালাক্ষী' জাতীয় নাম মনের সুখ উৎপাদন করে না), যে নাম মঙ্গলের বাচক হয় (যেমন চারুমতী, শর্মমতী; বিপরীত নাম যেমন 'অভাগা', 'মন্দভাগ্যা' প্রভৃতি হবে না), যে নামের শেষে দীর্ঘস্বর থাকে (যেমন 'ঈ'কার, আ-কার যুক্ত নাম), যে নামের উচ্চারণে আশীর্বাদ বোঝায় (যেমন 'সপুত্রা', 'বহুপুত্রা' প্রভৃতি)। (২/৩৩)।

মনুশাস্ত্রে নারীর সৌন্দর্যের ধারণা সম্পূর্ণই দৈহিক এবং তা নির্বাচনের ক্ষমতা একমাত্র পুরুষেরই একচ্ছত্র বলে সম্পূর্ণ পুরুষ-মনস্তত্ত্বজাত সৌন্দর্যবোধকেই নারীর ওপর সবলে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মনু পুরুষের ভোগের নৈবেদ্য হিসেবে বিবাহযোগ্য নারী নির্বাচনের লক্ষণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন—

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্॥

যে নারীর কোনও অঙ্গ বৈকল্য নেই (অর্থাৎ অবয়বসংস্থানের পরিপূর্ণতা বর্তমান), যার নামটি সৌম্য অর্থাৎ মধুর, যার গতি-ভঙ্গি হংস বা হস্তীর মতো (অর্থাৎ বিলাসযুক্ত ও মন্থরগমনযুক্তা), যার লোম, কেশ ও দন্ত নাতিদীর্ঘ, এবং যার অঙ্গসমূহ মৃদু অর্থাৎ সুখস্পর্শ (অর্থাৎ যে নারী কোমলাঙ্গী), এইরকম নারীকেই বিবাহ করবে। (৩/১০)।

আর এই আদর্শ লক্ষণযুক্তা নারীই যেহেতু ভোগোদ্যত পুরুষের পছন্দশীর্ষে অবস্থান করে, তাই এরূপ সুরূপা দেহযুক্তা নারীরত্ন সংগ্রহের সুবিধার্থে ব্রাহ্মণ্যবাদী তীব্র বর্ণপ্রথাকেও এই বিশেষ ক্ষেত্রে শিথিল করে মনু বলছেন—

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শূদ্রাদিজাতীয় লোকের কাছ থেকেও গারুড়াদি বিদ্যা অর্থাৎ সর্পমন্ত্র প্রভৃতি শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করবে; অন্ত্যজ চণ্ডালাদি জাতির (যারা পূর্বজন্মে যোগাভ্যাসযুক্ত ছিল) কাছ থেকেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম (অর্থাৎ মোক্ষের উপায় আত্মজ্ঞানাদি) গ্রহণ করবে; এবং দুষ্কুলজাত অর্থাৎ নিজের থেকে নিকৃষ্ট কুল থেকেও উত্তমা স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করবে। (২/২৩৮)।

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ॥

স্ত্রী, রত্ন (মণি-মাণিক্য), বিদ্যা, ধর্ম, শৌচ, হিতবাক্য এবং বিবিধ শিল্পকার্য সকলের কাছ থেকে সকলেই গ্রহণ করতে পারে। (২/২৪০)।

চূড়ান্ত বিচারে নারী যে আসলে মানুষ নয়, অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর মতোই পুরুষের ব্যবহারযোগ্য উপভোগের সামগ্রীমাত্র, উপর্যুক্ত শ্লোক থেকে বুঝতে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। তবে একটি ক্ষেত্রে বিবাহ-সম্বন্ধ করার ব্যাপারে মনুশাস্ত্রে স্পষ্টতই সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে—

যস্যাস্তু ন ভবেদ্ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা (বৈ) পিতা।
নোপযচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্মশঙ্কয়া॥

যে কন্যার কোনও ভ্রাতা নেই, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই কন্যাকে 'পুত্রিকা' হওয়ার আশঙ্কায় [ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে পিতা ইচ্ছা করলে পুত্রের মতো বিবেচনা করতে পারতেন, এইরকম কন্যাকে পুত্রিকা বলা হতো। আবার ভ্রাতৃহীনা কন্যার কোনও পুত্র হলে সে নিজে পুত্রস্থানীয় হয়ে সপিণ্ডনাদি কাজ সম্পন্ন করবে— অপুত্রক পিতার এইরকম অভিসন্ধি থাকলে সেই কন্যাকে পুত্রিকা বলা হত।] অথবা যে কন্যার পিতা সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না তাকে জারজ বা মদ্যপব্যক্তির দ্বারা জাত সন্তাবনায় অধর্ম হওয়ার ভয়ে বিবাহ করবে না। [অতএব, পুত্রিকাশঙ্কায় ভ্রাতৃহীনা কন্যা অবিবাহ্য এবং যার পিতৃসম্বন্ধ অজ্ঞাত-জারজত্ব সম্ভাবনায় এইরকম কন্যা অধর্মাশঙ্কায় অবিবাহ্য]। (৩/১১)।

পিতৃসম্পদের উত্তরাধিকার নির্বাচনের ধর্মীয় দায়ভাগ বিধানমতে পুত্রের অনুপস্থিতিতে 'পুত্রিকা' বিশেষ অবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে— এটা একান্ত নিরূপায় বিধান হলেও পুরুষতন্ত্রের জন্য নিশ্চয়ই বিব্রতকর বিষয়। কেননা পুরুষতন্ত্র কখনোই চায় না, নারী অর্থনৈতিক ক্ষমতা পাক। এর প্রতিবিধানকল্পে পুত্র উৎপাদনার্থে পুরুষের পুনর্বিবাহের সুযোগ রয়েছে, কিংবা অপুত্রক স্বামী মারা গেলে অনুমোদনকৃত বিশেষ নিয়োগপ্রথার মাধ্যমে বিধবাকে পুত্রবতী করার ব্যবস্থা থাকার পরও এসব ব্যবস্থা গ্রহণ না-করার খেসারত হিসেবেই হয়ত পুত্রিকাকে বিয়ের প্রসঙ্গে এসে সংকটে পড়তে হচ্ছে। অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষতন্ত্রের জন্য অসহ্য গাত্রদাহের বিষয়। এছাড়াও নারী যে তার দেহের বাইরে পিতৃপরিচয়েই অস্তিত্বমান এবং পিতৃপরিচয়ের নিশ্চয়তাবিধান যে পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্রের প্রধান হাতিয়ার, তা অক্ষুণ্ন ও নিরাপদ রাখার গুরুত্ব অনুধাবন করেই কন্যার বংশপরিচয়ের সুস্পষ্টতা থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অর্থাৎ নারীর জন্য পিতৃপরিচয় সম্পত্তির ধারণার চেয়ে বড়ো এবং পুরুষতন্ত্রের এই হাতিয়ারকে মনুশাস্ত্র কিছুতেই বিফল হতে দিতে রাজি নয়।

মনুশাস্ত্রে বিয়ে ও নারীর স্থান

বৈদিক শাস্ত্রে বিয়ে হচ্ছে সুনির্দিষ্ট উপভোগ্য নারীকে প্রয়োজনীয় ভোগের নিমিত্তে পুরুষের ব্যক্তি-মালিকানায় শর্তহীন হস্তান্তরের ধর্মসিদ্ধ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া যাতে কিছুতেই ব্যহত না হয়, সে লক্ষ্যে 'বিবাহ-সংস্কারকেই স্ত্রীলোকদের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ উপনয়নস্থানীয় বৈদিক সংস্কার' (২/৬৭) হিসেবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। 'এই সংস্কার সম্পন্ন না হলে স্ত্রীলোকদের দেহশুদ্ধি হয় না' (২/৬৬)। যেহেতু 'গর্ভধারণের জন্য নারী এবং গর্ভাধানের জন্য পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে' (১০/৯৬), তাই গর্ভধারণ করাই নারীর প্রধান কাজ হিসেবে বিবেচিত। আর পুত্রোৎপাদনের নিমিত্তে নারীদেহে গর্ভাধানের কাজটি ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদন করবে তার পুরুষ প্রভু বা স্বামী, যিনি বিবাহ নামক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ নারীদেহের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হন—

মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্॥

স্ত্রীলোকদের বিবাহকর্মে যা কিছু স্বস্ত্যয়ন বা প্রজাপতিযাগ অর্থাৎ বিবাহের দেবতা প্রজাপতির উদ্দেশ্যে যে হোম করা হয়, তা কেবল উভয়ের মঙ্গলার্থ মাত্র। স্ত্রীলোকগণকে প্রথমে যে বাগদান করা হয়, তার দ্বারাই স্ত্রীলোকের উপর পতির স্বামিত্ব জন্মায়; অতএব বাগদান থেকে আরম্ভ করেই স্ত্রীলোকদের স্বামীর সেবা করা কর্তব্য। (৫/১৫২)।

আর এজন্যেই বয়ঃসন্ধিকালে প্রজননক্ষম হওয়ামাত্রই কন্যাকে পাত্রস্থ করে দিতে মনুর উপদেশ—

কালেহদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ।
মৃতে ভর্তরি পুত্রস্তু বাচ্যো মাতুররক্ষিতা॥

বিবাহ-যোগ্য সময়ে অর্থাৎ ঋতুদর্শনের আগে পিতা যদি কন্যাকে পাত্রস্থ না করেন, তাহলে তিনি লোকমধ্যে নিন্দনীয় হন; স্বামী যদি ঋতুকালে পত্নীর সাথে সঙ্গম না করেন, তবে তিনি লোকসমাজে নিন্দার ভাজন হন। এবং স্বামী মারা গেলে পুত্রেরা যদি তাদের মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তাহলে তারাও অত্যন্ত নিন্দাভাজন হয়। (৯/৪)।

অর্থাৎ একটি কুমারী কন্যা প্রজননযোগ্যা ঋতুমতী হয়েও প্রজননকার্যে ব্যবহৃত না-হওয়া মনুশাস্ত্রেরই উল্লঙ্ঘন। সেক্ষেত্রে যথাসময়ে পাত্রস্থ না-করার কারণে কন্যার ওপর পিতার অধিকারও খর্ব হয়ে যায়। ফলে—

পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কন্তু কন্যামৃতুমতীং হরন্।
স হি স্বাম্যাদতিক্রামেদৃতূনাং প্রতিরোধনাৎ॥

ঋতুমতী কন্যাকে যে বিবাহ করবে সেই ব্যক্তি কন্যার পিতাকে কোনও শুল্ক দেবে না। কারণ, সেই পিতা কন্যার ঋতু নষ্ট করছেন বলে কন্যার ওপর তার যে অধিকার তা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। (৯/৯৩)।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বিয়ের বাজারে কন্যার একটা বিনিময়মূল্য রয়েছে, যা অধিকার হিসেবে পিতাই প্রাপ্ত হতেন। কিন্তু কন্যার ঋতু নষ্ট না-করার স্বার্থের সাথেই তা সম্পর্কিত। অতএব, ঋতু নষ্ট না-করা অর্থাৎ যথাসময়ে পাত্রস্থ করাটা খুবই গুরুত্ববহ। তবে যোগ্য পাত্র নির্বাচন করাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই গুণহীন পাত্রে কন্যাদান যেমন নিরুৎসাহিত করা হয়, তেমনি যোগ্য পাত্র পাওয়া গেলে ঋতুমতী হবার আগেই কন্যাকে সম্প্রদান করারও নির্দেশ করা হয়েছে—

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি॥

উৎকৃষ্ট অভিরূপ এবং সজাতীয় বর পাওয়া গেলে কন্যা বিবাহের বয়স প্রাপ্ত না হলেও তাকে যথাবিধি সম্প্রদান করবে। (৯/৮৮)।

নইলে

অদীয়মানা ভর্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাহধিগচ্ছতি॥

ঋতুমতী হওয়ার তিন বৎসর পরেও যদি ঐ কন্যাকে পাত্রস্থ করা না হয়, তাহলে সে যদি নিজেই পতি বরণ করে নেয়, তার জন্য সে কোনও পাপের ভাগী হবে না। কিংবা যাকে সে বরণ করে, তারও কোনও পাপ বা দোষ হবে না। (৯/৯১)।

এটাকে নারী বা কন্যার অধিকার হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং পিতার ব্যর্থতায় প্রজননযোগ্য কন্যার এই স্বপ্রণোদিত পুরুষানুগমন ধর্মীয় পিতৃতন্ত্রের বাধ্যবাধকতাই নির্দেশ করে। উল্লেখ্য, একই প্রেক্ষিতে সামাজিকভাবে নারীর বিয়ের বয়সটিও মনুশাস্ত্রে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে—

ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোহষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বরঃ॥

ত্রিশ বৎসর বয়সের পুরুষ বারো বৎসর বয়সের মনোমতো কন্যাকে বিবাহ করবে, অথবা, চব্বিশ বছর বয়সের পুরুষ আট বছরের কন্যাকে বিবাহ করবে। এর দ্বারা বিবাহযোগ্য কাল প্রদর্শিত হলো মাত্র। তিনগুণের বেশি বয়সের পুরুষ একগুণ বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করবে, এর কমবেশি বয়সে বিবাহ করলে ধর্ম নষ্ট হয়। (৯/৯৪)।

তবে যে দৃষ্টিতেই দেখা হোক না কেন, ধর্মভিত্তিক পুরুষতন্ত্রে বিয়ে মানেই হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক পছন্দসই নারী সংগ্রহ ও তার ওপর ব্যক্তি-মালিকানা প্রতিষ্ঠাকরণের সামাজিক বৈধতা আরোপনের প্রক্রিয়া মাত্র। এই প্রক্রিয়ার স্বরূপ অনুযায়ী বৈদিক শাস্ত্রে আট রকমের বিবাহের উল্লেখ রয়েছে—

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট (নিন্দিত) পৈশাচ— বিবাহ এই আটরকমের। (৩/২১)।

ষড়ানুপূর্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোহবরান্।
বিট্‌শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্যানরাক্ষসান্॥

(প্রথম থেকে) ক্রমানুসারে ছয়-প্রকার বিবাহ (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব) ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্মজনক (অতএব বিহিত); শেষ দিকের চারটি বিবাহ (আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ) ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত; এবং রাক্ষস ভিন্ন শেষের বাকি তিনটি বিবাহ (আসুর, গান্ধর্ব ও পৈশাচ) বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে বিহিত বলে জানবে। (৩/২৩)।

এবং এই আটপ্রকার বিবাহের স্বরূপ থেকেই বিবাহ-সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান বা ভূমিকা কী তার পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মবিবাহের স্বরূপ

আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়ম্ ।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ॥

শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার সম্পন্ন পাত্রকে (কন্যার পিতা) স্বয়ং আহ্বান করে (অর্থাৎ বরের দ্বারা ঐ পিতা প্রার্থিত না হয়ে) নিজের কাছে আনিয়ে বর ও কন্যাকে (দেশ অনুসারে যথাসম্ভব যথাযোগ্য) বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করে এবং অলঙ্কারাদির দ্বারা অর্চনা করে (অর্থাৎ বিশেষ প্রীতি ও বিশেষ সমাদর দেখিয়ে) ঐ বরের হাতে কন্যাকে যে সম্প্রদান করা হয়, তাকে ব্রাহ্মবিবাহরূপ ধর্মব্যবস্থা বলা হয় । [ব্রাহ্মবিবাহ সর্বোৎকৃষ্ট; এই বিবাহে যে কন্যাদান করা হয়, তাতে কোনও শর্ত বা স্বার্থ থাকে না] । (৩/২৭) ।

দৈববিবাহের স্বরূপ

যজ্ঞে তু বিততে সম্যগৃত্বিজে কর্ম কুর্বতে ।
অলংকৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে॥

জ্যোতিষ্টোমাদি বিস্তৃত যজ্ঞ আরম্ভ হলে সেই যজ্ঞে পুরোহিতরূপে যজ্ঞকার্যনিষ্পাদনকারী ঋত্বিককে যদি সালঙ্কারা কন্যা দান করা হয়, তাহলে এইরকম বিবাহকে মুনিগণ দৈব নামক শাস্ত্রবিহিত বিবাহ বলে থাকেন । [ব্রাহ্মবিবাহে নিঃশর্তভাবে কন্যাদান করা হয় । দৈববিবাহে কন্যাদান করা হয় বটে, কিন্তু যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত ঋত্বিকের কাছ থেকে পুণ্যফল লাভের সম্ভাবনা থাকায় এই কন্যাদানটিকে একেবারে শুদ্ধদানের পর্যায়ে ফেলা যায় না] । (৩/২৮) ।

আর্ষবিবাহের স্বরূপ

একং গোমিথুনং দ্বে বা বরাদাদায় ধর্মতঃ ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্মঃ স উচ্যতে॥

ধর্মশাস্ত্রের বিধান-অনুসারে বরের কাছ থেকে এক জোড়া, বা দুই জোড়া গোমিথুন (অর্থাৎ একটি গাভি ও একটি বলদ) গ্রহণ করে ঐ বরকে যথাবিধি কন্যাসম্প্রদান ধর্মানুসারে আর্ষ-বিবাহ নামে অভিহিত হয় । [এখানে বরের কাছ থেকে গোমিথুন-দানগ্রহণ একটি ধর্মীয় ব্যাপার । তাই এটি কন্যার শুল্ক বা বিনিময় মূল্যস্বরূপ নয় । কাজেই এখানে কন্যা-বিক্রয় করা হচ্ছে এমন মনে করা উচিত নয় । টিকাকার মেধাতিথির মতে, এখানে অল্পই হোক, বা বেশিই হোক, কোনও ঋণপরিশোধের ব্যাপার নেই] । (৩/২৯) ।

প্রাজাপত্যবিবাহের স্বরূপ

সহোভৌ চরতাং ধর্মমিতি বাচানুভাষ্য চ ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥

'তোমরা দুইজনে মিলে একসঙ্গে গার্হস্থ্যধর্মের অনুষ্ঠান কর'— বরের সাথে এইরকম চুক্তি করে এবং তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিরূপে স্বীকৃতি আদায় করে, অলঙ্কারাদির দ্বারা বরকে অর্চনাপূর্বক কন্যাসম্প্রদান প্রাজাপত্যবিবাহ নামে স্মৃতিমধ্যে অভিহিত হয়েছে । [সম্ভবত এই বিবাহে বর নিজে থেকে প্রার্থী হয়ে উপস্থিত হন । প্রাজাপত্যবিবাহে যে কন্যাদান করা হয়, সে দান শুদ্ধ নয়, কারণ এখানে দানের শর্ত আরোপ করা হয়] । (৩/৩০) ।

আসুরবিবাহের স্বরূপ

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম উচ্যতে॥

কন্যার পিতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী (কিন্তু শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে নয়) এবং যথাশক্তি অর্থ দিয়ে এবং কন্যাটিকেও স্ত্রীধন দিয়ে যে কন্যার 'আ-প্রদান' অর্থাৎ কন্যাগ্রহণ করা হয়, তা আসুরবিবাহ নামে অভিহিত হয়ে থাকে । [আসুরবিবাহের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, এই বিবাহে স্বেচ্ছানুসারে ধন দিয়ে অর্থের জোরে কন্যা গ্রহণ বা ক্রয় করা হয়, কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে নয় । এখানেই আর্ষবিবাহ থেকে আসুরবিবাহের পার্থক্য । আর্ষবিবাহে যেমন গোমিথুন নির্দিষ্ট করা হয়, আসুরবিবাহে তেমন হয় না । এখানে বর কন্যার রূপ ও গুণে আকৃষ্ট হয়ে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কন্যার মূল্যস্বরূপ অনির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক বা অর্থের বিনিময়ে কন্যা গ্রহণ বা সংগ্রহ করা হয়] । (৩/৩১) ।

গান্ধর্ববিবাহের স্বরূপ

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥

কন্যা ও বর উভয়ের ইচ্ছাবশত (অর্থাৎ প্রেম বা অনুরাগবশত) যে পরস্পর সংযোগ (কোনও একটি জায়গায় সঙ্গমন বা মিলন) তা গান্ধর্ববিবাহ; এই বিবাহ মৈথুনার্থক অর্থাৎ পরস্পরের মিলন বাসনা থেকে সম্ভূত এবং কামই তার প্রযোজক বা কারণস্বরূপ। (৩/৩২)।

রাক্ষসবিবাহের স্বরূপ

হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥

বাধাপ্রদানকারী কন্যাপক্ষীয়গণকে (আহত) নিহত করে, (অঙ্গ) প্রত্যঙ্গ ছেদন করে এবং গৃহ প্রাচীর প্রভৃতি ভেদ করে যদি কেউ চীৎকারপরায়ণা ও ক্রন্দনরতা কন্যাকে গৃহ থেকে বলপূর্বক অপহরণ করে, তবে একে রাক্ষসবিবাহ বলা হয়। (৩/৩৩)।

পৈশাচবিবাহের স্বরূপ

সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥

নিদ্রাভিভূতা, মদ্যপানের ফলে বিহ্বলা, বা রোগাদির দ্বারা উন্মত্তা কন্যাকে যদি গোপনে (বা প্রকাশ্যে) সম্ভোগ করা হয়, তাহলে তা পৈশাচবিবাহ নামে অভিহিত হবে; আটরকমের বিবাহের মধ্যে এই অষ্টম বিবাহটি পাপজনক ও সকল বিবাহ থেকে নিকৃষ্ট (এই বিবাহ থেকে ধর্মাপত্য অর্থাৎ ধর্মজ-পুত্র জন্মে না)। [পৈশাচবিবাহে মিথ্যা বা ছল আশ্রয় করে গোপনে কন্যা সংগ্রহ করা হয় বলে এ বিবাহ খুবই নিন্দিত। তবে টিকাকারদের অভিমত এই যে, পরে হোমসংস্কারের দ্বারা ঐ নিন্দনীয় সকল বিবাহেরই স্বীকৃতি দেয়া হয়]। (৩/৩৪)।

এই আটপ্রকার বিয়ের স্বরূপ দেখে এটা মনে করা বাহুল্য হবে না যে, বৈদিক শাস্ত্রে বিয়ে মানে পুরুষের নারী সংগ্রহের সামাজিক অভিযান কেবল। প্রাথমিক দৃষ্টিতে এই সংগ্রহ অভিযান শোভন বা অশোভন বা নিন্দনীয় যা-ই দেখাক না কেন, পুরুষতন্ত্র নিজের প্রয়োজনেই তার স্বীকৃতির ব্যবস্থা রেখেছে। তবে নারী যে পূর্ণমাত্রায় কেবল সম্পত্তিই, এর প্রমাণ হচ্ছে নারী দানযোগ্য, ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য কিংবা বলপূর্বক হরণযোগ্য। অর্থাৎ যেভাবেই হোক, তার মালিকানার হস্তান্তর ঘটে মাত্র। তাই বস্তুগত ক্রয়-বিক্রয় বা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় যেমন ভেজাল দেয়া অনৈতিক বলে গণ্য হয়, তেমনি প্রয়োজনীয় নারী সংগ্রহের হস্তান্তর প্রক্রিয়ায়ও কোনোরূপ ব্যতিক্রম সহ্য করা হয় না—

অন্যাং চেদ্ দর্শয়িত্বান্যা বোঢ়ুঃ কন্যা প্রদীয়তে।
উভে তে একশুল্কেন বহেদিত্যব্রবীন্মনুঃ॥

বরের নিকট থেকে পণ নেয়ার সময়ে একটি কন্যাকে দেখিয়ে বিবাহের সময়ে যদি তাকে (বরকে) অন্য একটি মেয়েকে দেয়া হয়, তা হলে সেই বরটি ঐ একই শুল্কে দুইটি কন্যাকেই পাবে, মনু নিজেই একথা বলেছেন। (৮/২০৪)।

নোন্মত্তায়া ন কুষ্ঠিন্যা ন চ যা স্পৃষ্ঠমৈথুনা।
পূর্বং দোষানভিখ্যাপ্য প্রদাতা দণ্ডমর্হতি॥

মেয়েটি উন্মত্তা কিংবা কুষ্ঠরোগগ্রস্তা কিংবা অন্যপুরুষের দ্বারা উপভুক্তা,— কন্যার এসব দোষ বিবাহের আগেই বলে দিলে অর্থাৎ শুল্ক নেবার আগেই তা কথায় প্রকাশ করে দিলে আর সেই কন্যাদানকারী দণ্ডনীয় হবে না। (৮/২০৫)।

নইলে এক্ষেত্রে রাজার বিচারে অপরাধের মাত্রাবিচারে বিভিন্ন দণ্ডের বিধান মনুসংহিতায় উদ্ধৃত রয়েছে। তবুও—

বিধিবৎপ্রতিগৃহ্যাপি ত্যজেৎ কন্যাং বিগর্হিতাম্।
ব্যাধিতাং বিপ্রদুষ্টাং বা ছদ্মনা চোপপ্যাদিতাম্॥

বর যথাবিধি কন্যাকে গ্রহণ করেও যদি দেখে যে মেয়েটি বিগর্হিতা, ব্যাধিতা, বিপ্রদুষ্টা কিংবা তাহার স্বরূপ গোপন করে তাকে সম্প্রদান করা হয়েছে, তা হলে তাকে পরিত্যাগ করবে। (৯/৭২)।

আবার

ন দত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতাম্॥

যার উদ্দেশ্যে কন্যা বাগদত্তা হবে, তার মৃত্যুর পরও বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজের ঐ বাগদত্তা কন্যাকে আবার অন্য পুরুষকে সমর্পণ করবে না। কারণ ঐ ভাবে একজনের উদ্দেশ্যে দত্তা কন্যাকে আবার অন্যকে দান করলে পুরুষানৃত প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ যদি কোনও ব্যক্তি ঐরকম করে তাহলে সমগ্র মানবজাতিকে প্রতারণা করার যে পাপ হয়, সে তার ভাগী হয়। (৯/৭১)।

অর্থাৎ এক্ষেত্রে নারীটির জৈব-মানসিক চাহিদাকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হলো।

আমরা আগেই দেখেছি যে, নারী বা স্ত্রী সকলের কাছ থেকে সকলেই গ্রহণ করতে পারে (২/২৪০)। তবু ব্রাহ্মণ্যবাদের রক্ষকেরা কিন্তু তাদের মৌলিক বর্ণবাদী নীতিকে ভুলে যায় নি একটুও। তাই নারী শূদ্র-সমতুল্য হলেও (৯/১৮), নারীর প্রাথমিক রক্ষকের (অর্থাৎ পিতৃবংশের) বর্ণ-অবস্থান বা আভিজাত্যের নিরিখেই তারও স্তর বা জাতিভেদ আরোপ করে আরো নিগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে নারী নির্বাচন ও সংগ্রহের মনুশাস্ত্রীয় প্রক্রিয়ায় পুরুষের প্রতি মনুর পরামর্শ—

সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥

সকল বর্ণের পক্ষেই স্বপরিণীতা ও অক্ষতযোনি (অর্থাৎ প্রথমবিবাহিতা এবং যার সাথে আগে কোনও পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক হয় নি) সবর্ণ বা সমান জাতির নারীর গর্ভে সবর্ণ পতিকর্তৃক উৎপাদিত সন্তান পিতামাতার জাতি থেকে অভিন্ন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণকর্তৃক উৎপাদিত সন্তান 'ব্রাহ্মণ' হবে; ক্ষত্রিয়কর্তৃক এই রকম ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান 'ক্ষত্রিয়' হবে; বৈশ্যকর্তৃক স্বপরিণীতা ও অক্ষতযোনি বৈশ্যার গর্ভে উৎপাদিত সন্তান 'বৈশ্য' এবং শূদ্রকর্তৃক ঐ রকম শূদ্রার গর্ভে উৎপাদিত সন্তান 'শূদ্র' হবে। এসব ছাড়া অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান জনকের সাথে সবর্ণ হয় না, নিশ্চয়ই জাত্যন্তর হবে। (১০/৫)।

তাই

সবর্ণাহগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য— এই দ্বিজাতিগণের দারপরিগ্রহব্যাপারে সর্বপ্রথমে (অর্থাৎ অন্য নারীকে বিবাহ করার আগে) সমানজাতীয়া কন্যাকেই বিবাহ করা প্রশস্ত। কিন্তু কামনাপরায়ণ হয়ে পুনরায় বিবাহে প্রবৃত্ত হলে [অর্থাৎ সবর্ণাকে বিবাহ করা হয়ে গেলে তার ওপর যদি কোনও কারণে প্রীতি না জন্মে অথবা পুত্রের উৎপাদনের জন্য ব্যাপার নিষ্পন্ন না হলে যদি কাম-প্রযুক্ত অন্যস্ত্রী-অভিলাষ জন্মায় তাহলে] দ্বিজাতির পক্ষে বক্ষ্যমাণ নারীরা প্রশস্ত হবে। (৩/১২)।

শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

একমাত্র শূদ্রকন্যাই শূদ্রের ভার্যা হবে; বৈশ্য সজাতীয়া বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করতে পারে; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সবর্ণা ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্যা হতে পারে; আর ব্রাহ্মণের পক্ষে সবর্ণা ব্রাহ্মণকন্যা এবং ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা ভার্যা হতে পারে। [এটা 'অনুলোম' বিবাহের প্রসঙ্গ। উচ্চবর্ণের পুরুষের সাথে নীচবর্ণের কন্যার বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলে। এর বিপরীত বিবাহ অর্থাৎ তুলনামূলক উচ্চবর্ণের কন্যাকে নিম্নবর্ণের পুরুষকর্তৃক বিবাহের নাম প্রতিলোম বিবাহ। প্রতিলোম বিবাহ সকল স্মৃতিকারদের দ্বারাই নিন্দিত। মনু মনে করেন, প্রথমে সজাতীয়া কন্যার সাথে বিবাহই প্রশস্ত। পুনর্বিবাহের ইচ্ছা হলে অনুলোম-বিবাহের সমর্থন দেয়া হয়েছে]। (৩/১৩)।

এখানে একটু খেয়াল করলেই উচ্চবর্ণীয় প্রভাবশালী ক্ষমতাধর পুরুষকর্তৃক হীনবর্ণীয়া একাধিক নারীভোগ করার শাস্ত্রীয় অনুমোদনের সূক্ষ্ম রাজনীতিটা স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রথম বিয়েটা সবর্ণা নারীর সাথে হওয়া বাঞ্ছনীয় এজন্যেই যে, তার থেকে জাত-পুত্র পিতার বংশরক্ষা ও উত্তরাধিকারের সহায়ক হয়, যা হীনবর্ণা স্ত্রী-জাত বর্ণসংকর সন্তানে শাস্ত্রীয় সংকট তৈরি করে। কেননা—

জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানবঃ।
পিতৃণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্বমর্হতি॥

উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই জ্যেষ্ঠপুত্র অসংস্কৃত থাকলেও তার দ্বারাই মানুষ পুত্রবিশিষ্ট হয় এবং ঐ পুত্র তার পিতৃপুরুষগণকে পুন্-নামক নরক থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য সে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হয়; জ্যেষ্ঠই প্রকৃত অর্থে পুত্রপদবাচ্য। এইরকম বিচার করলে, জ্যেষ্ঠই সমস্ত পিতৃধন লাভ করার যোগ্য। (৯/১০৬)।

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥

যে হেতু পুত্র 'পুৎ' নামক নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করে এই কারণে স্বয়ং ব্রহ্মা তাকে 'পুত্র' এই নামে অভিহিত করেছেন। [পৃথিবীতে যে সব প্রাণীর উৎপত্তি হয় তাদের সেই উৎপত্তিটাকেই পুৎ নামক নরক বলা হয়। পুত্র জন্মালে পিতাকে তা থেকে পরিত্রাণ করে অর্থাৎ পিতা তখন পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ না করে দেবলোকে জন্মপ্রাপ্ত হয়। সেই কারণে তাকে 'পুত্র' বলা হয়]। (৯/১৩৮)।

যস্মিন্নৃনং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে।
স এব ধর্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ॥

যে জ্যেষ্ঠপুত্রের উৎপত্তিমাত্র পিতা পিতৃঋণ পরিশোধ করেন, এবং যার দ্বারা পিতা মোক্ষ লাভ করেন, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যথার্থ ধর্মজ-সন্তান বলা যায়; অবশিষ্ট পুত্রগুলি সব কামজ, জ্ঞানীরা এইরকম বিবেচনা করেন। (৯/১০৭)।

তাই পারলৌকিক মুক্তি বা ইহলৌকিক ক্ষমতাকেন্দ্রিক বর্ণ-প্রাধান্যের কারণেই দ্বিজদের জন্যে সবর্ণা কন্যার সাথে প্রথম বিয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা ঠিক থাকলে বর্ণ-শ্রেষ্ঠদের জন্য পরবর্তী অনুলোম বিবাহের মাধ্যমে অতিরিক্ত কামনা চরিতার্থের সুযোগ শাস্ত্রই অবারিত রেখেছে। তবে যেহেতু বর্ণ-সংকর সন্তান সৃষ্টি ক্ষমতাকেন্দ্রিক সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্টের কারণ হতে পারে, তাই হীনবর্ণা নারীকে সর্বস্তরের পুরুষের ইচ্ছানুরূপ সম্ভোগের সবরকম সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে শুধু তাদের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনকে কৌশলে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে—

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিরা যদি মোহবশত (ধনলাভজনিত অবিবেকবশতই হোক অথবা কামপ্রেরিত হয়েই হোক) হীনজাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহলে তাদের সেই স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্রপৌত্রাদির সাথে নিজ নিজ বংশ শীঘ্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। (৩/১৫)।

শূদ্রাবেদী পততাত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ॥

শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করলেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হন,— এটি অত্রি এবং উতথ্যতনয় গৌতম মুনির মত। শৌনকের মতে, শূদ্রা নারীকে বিবাহ করে তাতে সন্তানোৎপাদন করলে ব্রাহ্মণাদি পতিত হয়। ভৃগু বলেন, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সন্তান হলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি পতিত হয়। [মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের মতে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর ক্ষেত্রেই এই পাতিত্য বুঝতে হবে। কুল্লুক ভট্টের মতে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য— এই তিনজাতির শূদ্রা স্ত্রী সম্বন্ধেই এই পাতিত্য হবে]। (৩/১৬)।

শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করে শূদ্রা নারীকে প্রথমে বিবাহ করে নিজ শয্যায় গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ অধোগতি (নরক) প্রাপ্ত হন; আবার সেই স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করলে তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েন [অতএব সমানজাতীয়া নারী বিবাহ না করে দৈবাৎ শূদ্রা বিবাহ করলেও তাতে সন্তান উৎপাদন করা ব্রাহ্মণের উচিত নয়]। (৩/১৭)।

ইত্যাদি অর্থাৎ বংশ পতনের কারণ সৃষ্টি হয় কেবল হীনজাতীয়া স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্রপৌত্রাদি দিয়েই। তা না হলে আর কোনো সমস্যা নেই। তারপরও

দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তং ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি॥

শূদ্রা ভার্যা গ্রহণের পর যদি ব্রাহ্মণের দৈবকর্ম (যথা, দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ প্রভৃতি এবং দেবতার উদ্দেশ্যে যে ব্রাহ্মণভোজনাদি হয়, তা), পিত্র্যকর্ম (পিতৃপুরুষের প্রতি করণীয় কর্ম, যথা, শ্রাদ্ধ, উদক-তর্পণ প্রভৃতি) এবং আতিথেয় কর্ম (যেমন, অতিথির পরিচর্যা, অতিথিকে ভোজন দান প্রভৃতি) প্রভৃতিতে শূদ্রা ভার্যার প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ ঐ কর্মগুলি যদি শূদ্রা স্ত্রীকর্তৃক বিশেষরূপে সম্পন্ন হয়, তাহলে সেই দ্রব্য পিতৃপুরুষগণ এবং দেবতাগণ ভক্ষণ করেন না এবং সেই গৃহস্থ ঐ সব দেবকর্মাদির ফলে স্বর্গেও যান না (অর্থাৎ সেই সব কর্মানুষ্ঠান নিষ্ফল হয়)। (৩/১৮)।

অর্থাৎ শূদ্রা নারী ব্রাহ্মণের ভার্যা হয়ে ব্রহ্মভোগের বস্তু হন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর কোনো মর্যাদাই তার প্রাপ্য হয় না।

অন্যদিকে হীনবর্ণীয় পুরুষ কর্তৃক উচ্চবর্ণা নারী সম্ভোগকারী প্রতিলোম-বিবাহকে তীব্রভাবে নিন্দিত বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর কারণ কিন্তু নারীকে বা নারীর কোনো আভিজাত্যকে সমুন্নত করা নয় কিছুতেই। মূলত ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের সামাজিক ক্ষমতা-কাঠামোয় বর্ণশ্রেষ্ঠের প্রভাব ও আভিজাত্যকে রক্ষা ও নিষ্কণ্টক রাখার নিরাপোষ খবরদারি তা। এক্ষেত্রে শূদ্রসমতুল্য নারী তার সহজাত দেহটি নিয়ে রক্ষকের বর্ণস্তরের আপাত প্রতীক হিসেবেই চিহ্নিত শুধু। তাই হীনজাতীয় পুরুষকর্তৃক উচ্চবর্ণের নারীসম্ভোগ সরাসরি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবেই গণ্য হয়—

উত্তমাং সেবমানস্তু জঘন্যো বধমর্হতি।
শুল্কং দদ্যাৎ সেবমানঃ সমামিচ্ছেৎ পিতা যদি॥

কোনও হীনজাতীয় পুরুষ যদি কোনও উচ্চবর্ণের কন্যাকে তার ইচ্ছা অনুসারেও সম্ভোগ করতে থাকে, তাহলে সেই পুরুষের বধদণ্ড হবে। কিন্তু নিজের সমানজাতীয়া কন্যার সাথে ঐরকম করলে সে ঐ কন্যার পিতাকে শুল্ক দেবে, যদি তার পিতা ঐ শুল্ক নিতে ইচ্ছুক হয়। (৮/৩৬৩)।

শূদ্রো গুপ্তমগুপ্তং বা দ্বৈজাতং বর্ণমাবসন্।
অগুপ্তমঙ্গসর্বস্বৈর্গুপ্তং সর্বেণ হীয়তে॥

কোনও দ্বিজাতি-নারী স্বামীর দ্বারা রক্ষিত হোক বা না-ই হোক, কোনও শূদ্র যদি তার সাথে মৈথুন ক্রিয়ার দ্বারা উপগত হয়, তাহলে অরক্ষিতা নারীর সাথে সঙ্গমের শাস্তিস্বরূপ তার সর্বস্ব হরণ এবং লিঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড হবে; আর যদি স্বামীর দ্বারা রক্ষিতা নারীর সাথে সম্ভোগ করে তাহলে ঐ শূদ্রের সর্বস্বহরণ এবং মারণদণ্ড হবে। (৮/৩৭৪)।

এভাবে অন্যান্য দ্বিজাতি পুরুষও যদি তার চেয়ে তুলনামূলক উচ্চবর্ণের রক্ষিতা বা অরক্ষিতা নারীসম্ভোগ করে, তাহলে শূদ্রের মতো তীব্রদণ্ড না হলেও বিভিন্ন দণ্ডের বিধান মনুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এছাড়াও পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিবাহকার্যে একেবারে আনকোরা অক্ষত নারী সরবরাহের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে নারী সংরক্ষণের নিমিত্তে মনুসংহিতায় ব্যভিচার রোধকল্পে বর্ণস্তর অনুযায়ী বিভিন্নমাত্রার দণ্ডবিধান রাখা হয়েছে। যা অবশ্যই বর্ণ নিরপেক্ষ নয়। এক্ষেত্রে দণ্ডবিধান উচ্চবর্ণীয়দের অনুকূলই বলা যায়।

তবে প্রতিলোম-প্রক্রিয়ায় স্ত্রী-ভোগের ফলাফল শুধু এই দণ্ডদানেই থেমে থাকে না। উচ্চবর্ণের স্ত্রীভোগ গুরুতর সামাজিক অপরাধ বা দূষণ হিসেবেও চিহ্নিত। তাই এ প্রক্রিয়ায় দ্বিজাতি পুরুষসৃষ্ট সন্তান উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় বর্ণ-সংকট তৈরি করে বর্ণ-অবনমন ঘটালেও, শূদ্রবর্ণের পুরুষের উৎপাদিত বর্ণসংকর সন্তান তাদের পুত্র-অধিকার হারিয়ে নরাধম হয়ে যায়। এখানে বর্ণবৈষম্য খুবই স্পষ্ট। আর এ অপরাধের মাত্রা বা দূষণপ্রক্রিয়া তীব্রতম হলে অর্থাৎ শূদ্রপুরুষ কর্তৃক ব্রাহ্মণা স্ত্রী দূষিত হলে উৎপাদিত বর্ণসংকর অস্পৃশ্য চণ্ডাল হয়ে যায়—

আয়োগবশ্চ ক্ষত্তা চ চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্।
প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাস্ত্রয়ঃ॥

শূদ্র পুরুষ থেকে প্রতিলোমক্রমে জাত অর্থাৎ শূদ্র পুরুষের ঔরসে বৈশ্যা স্ত্রীতে জাত আয়োগব, ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে জাত ক্ষত্তা এবং ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে জাত চণ্ডাল— এই তিন জাতি পুত্রকাজ করার অযোগ্য। এই জন্য এরা অপসদ অর্থাৎ নরাধম বলে পরিগণিত হয়। এদের মধ্যে চণ্ডাল হলো অস্পৃশ্য। (১০/১৬)।

চণ্ডালশ্বপচানাং তু বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
অপপাত্রাশ্চ কর্তব্যা ধনমেষাং শ্বগর্দভম্॥

চণ্ডাল, শ্বপচ প্রভৃতি জাতির বাসস্থান হবে গ্রামের বাইরে। এইসব জাতিকে 'অপপাত্র' করে দিতে হয়; কুকুর এবং গাধা হবে তাদের ধনস্বরূপ। (অপপাত্র হলো যে পাত্রে ভোজন করলে তা আর সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ করা চলবে না, তা পরিত্যাগই করতে হবে। অথবা তারা যে পাত্র স্পর্শ করে থাকবে তাতে অন্ন-শক্তু প্রভৃতি দেয়া চলবে না; কিন্তু পাত্রটি মাটির ওপর রেখে দিলে কিংবা অন্য কোনও লোক তা হাতে করে ধরে থাকলে তার ওপর ভাত-ছাতু প্রভৃতি দিয়ে মাটির ওপর রেখে দিলে তারা ঐ খাদ্য গ্রহণ করবে। অন্য অর্থে ভাঙা পাত্রকে অপপাত্র বলে)। (১০/৫১)।

অতএব, সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, পুরুষতান্ত্রিক বৈদিক ধর্মব্যবস্থায় নারীর নিজের কোনো বর্ণ নেই বলে সাধারণ দৃষ্টিতে নারী শূদ্রসমতুল্য। ফলে নারী হচ্ছে পুরুষের ইচ্ছানুরূপ ভোগের নৈবেদ্য। তাকে যথেচ্ছ ভোগ করার পুরুষকেন্দ্রিক বৈধতা রয়েছে। তবে সহজাত পিতৃবর্ণের স্তরভেদ অনুযায়ী নারীর যে আপেক্ষিক বর্ণপরিচয় দাঁড় করানো হয়, তা মূলত আধিপত্যকামী পুরুষতন্ত্রের নিজস্ব আভিজাত্যের আন্তঃবৈষম্য নির্ণায়ক সামাজিক প্রতীক মাত্র। তাই তাকে ইচ্ছেখুশি ভোগ করা গেলেও উপজাত হিসেবে সৃষ্ট সন্তানের দ্বারা সমাজে প্রচলিত সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রিক উচ্চ-নিচ বর্ণ-ভারসাম্য নষ্ট করা চলবে না কিছুতেই। কেননা পুরুষতন্ত্রে নারীই হচ্ছে সেই একমাত্র উপাদান, যাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজ-নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় সমাজ-শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে প্রয়োজনমতো পরিচালিত করা হয়।

মনুর দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃতি ও সম্পত্তি বিচার

প্রাকৃতিকভাবেই নারী যে পুরুষের মতোই প্রাণীজ আবেগসম্পন্ন জৈব-মানসিক সত্তা, তা পিতৃতান্ত্রিক কূটবুদ্ধিতে অজানা থাকার কথা নয়। তাই নারীকে ক্ষমতা ও অধিকারশূন্য করে পিতৃতন্ত্রের পূর্ণ-কব্জায় নিতে গিয়ে পুরুষের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক সংকট ও জটিলতা তৈরি হয়েছিল, শেষপর্যন্ত তা হয়ত গোপন রাখা যায় নি। আর এই সংকট ও নিজেদের ব্যভিচার ঢেকে রাখার আপ্রাণ অপচেষ্টা হিসেবে নারীকে হীনস্বভাবী আখ্যায়িত করে তার ওপর খুব সচেতনভাবেই কতকগুলো আপত্তিকর অপবাদ কৌশলে চাপিয়ে দিয়েছে পুরুষ—

স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।
অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥

ইহলোকে (শৃঙ্গার চেষ্টার দ্বারা মোহিত করে) পুরুষদের দূষিত করাই নারীদের স্বভাব; এই কারণে পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখনোই অনবধান হন না। (২/২১৩)।

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্॥

ইহলোকে কোনও পুরুষ 'আমি বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয়' মনে করে স্ত্রীলোকের সন্নিধানে বাস করবেন না; কারণ, বিদ্বানই হোন বা অবিদ্বানই হোন, দেহধর্মবশত কামক্রোধের বশীভূত পুরুষকে কামিনীরা অনায়াসে বিপথে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। (২/২১৪)

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা না বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

মাতা, ভগিনী বা কন্যার সাথে কোনও পুরুষ নির্জন গৃহাদিতে বাস করবে না, কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বলবান্ (চঞ্চল) যে, এরা (শাস্ত্রালোচনার দ্বারা আত্মসংযম অভ্যাস করতে পেরেছেন এমন) বিদ্বান ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে (অর্থাৎ কামক্রোধাদির বশবর্তী করে তোলে)। (২/২১৫)।

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
গুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥

বস্তুতপক্ষে স্ত্রীলোকেরা যে সৌন্দর্যে আসক্ত হয় তা নয় কিংবা পুরুষের বিশেষ বয়সের ওপর নির্ভর করে তা-ও নয়। কিন্তু যার প্রতি আকৃষ্ট হয় সে লোকটি সুরূপই হোক বা কুরূপই হোক তাতে কিছু যায় আসে না, যেহেতু ব্যক্তিটি পুরুষ এইজন্যেই তার প্রতি আসক্ত হয় (এবং তার সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হয়)। (৯/১৪)।

শয্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ॥

বেশি নিদ্রা যাওয়া, কেবল বসে থাকার ইচ্ছা, শরীরকে অলংকৃত করা, কাম অর্থাৎ পুরুষকে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ, নীচহৃদয়তা, অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং কুচর্যা অর্থাৎ নীচ পুরুষকে ভজনা করা— স্ত্রীলোকদের এই সব স্বভাব মনু এদের সৃষ্টি-কালেই করে গিয়েছেন। (৯/১৭)।

অর্থাৎ পুরুষের নিজস্ব দুরাচারকে সুকৌশলে ব্রহ্মবাক্য দিয়ে শেষপর্যন্ত নারীর ওপরই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও আসলে পুরুষই যে অভব্য হয়, সেই নীচত্ব ঢাকতে গিয়ে নারীকে একটা নিকৃষ্ট কামজ সত্তা প্রমাণেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে হীনম্মন্য পুরুষ। এ কারণে মনুশাস্ত্রে নারীর স্বাধীনতাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে বলা হচ্ছে, নারী স্বাধীনাবস্থায় অবস্থানের যোগ্য নয়—

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্যং গৃহেষবপি॥

স্ত্রীলোক বালিকাই হোক, যুবতীই হোক কিংবা বৃদ্ধাই হোক, সে গৃহমধ্যে থেকে কোনও কাজই স্বামী প্রভৃতির অনুমতি ছাড়া করতে পারবে না। (৫/১৪৭)।

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥

স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনকালে পাণিগ্রহীতার অর্থাৎ স্বামীর অধীনে থাকবে এবং স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রদের অধীনে থাকবে। (পুত্র না থাকলে স্বামীর সপিণ্ড, স্বামীর সপিণ্ড না থাকলে পিতার সপিণ্ড এবং পিতার সপিণ্ড না থাকলে রাজার বশে থাকবে), কিন্তু কোনও অবস্থাতেই স্ত্রীলোক স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে না। (৫/১৪৮)।

উল্লেখ্য যে, সপিণ্ড মানে যিনি মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পিণ্ড দানের যোগ্য। হিন্দুশাস্ত্রে পিণ্ডদানের ক্রমাধিকারের সাথে সম্পত্তির অধিকার অর্জনের বিষয়ও জড়িত।

এবং মনুর পুরুষ-দৃষ্টি এতটাই একচক্ষু যে, নারীকে কখনো বিশ্বাসও করা যাবে না। তাই—

পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্যাদুভে কুলে॥

স্ত্রীলোক কখনো পিতা, স্বামী কিংবা পুত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না; কারণ, স্ত্রীলোক এদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে পিতৃকুল ও পতিকুল— উভয় কুলকেই কলঙ্কিত করে তোলে। (৫/১৪৯)।

অর্থাৎ নারীর জীবন পিতা বা স্বামীর কুলেই সীমাবদ্ধ। নিজের কোনো কুল নেই বলে এই কুলহীনতা নারীকে এক ধরনের সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে। ফলে চূড়ান্ত বিচারে নারী পুরুষের অধীনতাই স্বীকার করতে বাধ্য।

পুরুষ-কেন্দ্রিকতায় নারীর প্রতি এই সম্পত্তি-ধারণা থেকেই হয়ত পুরুষের নারীসংরক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভূত। অসতর্ক হলেই এ সম্পত্তি নষ্ট বা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাই মনুশাস্ত্রে উক্ত হয়—

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্তঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে॥

স্ত্রীলোকদের আত্মীয় পুরুষগণের [অর্থাৎ পিতা, স্বামী, পুত্র প্রভৃতি যে সব পুরুষ স্ত্রীলোককে রক্ষা করবার অধিকারী, তাদের] উচিত হবে না, দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনও সময়ে স্ত্রীলোককে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতে দেয়া [অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা

যে নিজেদের ইচ্ছামতো ধর্ম, অর্থ ও কামে প্রবৃত্ত হবে তা হতে দেবে না]। স্ত্রীলোকেরা গান-বাজনা প্রভৃতি বিষয়ে আসক্ত হতে থাকলে তা থেকে তাদের নিবৃত্ত করে নিজের বশে রাখতে হবে। (৯/২)।

ইমং হি সর্ববর্ণানাং পশ্যন্তো ধর্মমুত্তমম্।
যতন্তে রক্ষিতুং ভার্যাং ভর্তারো দুর্বলা অপি॥

স্ত্রীলোককে রক্ষণরূপ-ধর্ম সকল বর্ণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ধর্ম— অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এই ব্যাপার বুঝে অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি দুর্বল স্বামীরাও নিজ নিজ স্ত্রীকে রক্ষা করবার জন্য যত্ন করবে। (৯/৬)।

শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে বলেই যে কেবল ভার্যাকে রক্ষা করা কর্তব্য, এমন নয়; স্ত্রীর দ্বারা নানারকম প্রয়োজন সাধিত হয় বলেও ঐ রক্ষণরূপ কাজ করা কর্তব্য—

স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেব চ।
স্বঞ্চ ধর্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি॥

যে লোক যত্নের সাথে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করে, তার দ্বারা নিজ সন্তান রক্ষিত হয়। কারণ, সাঙ্কর্যাদি দোষ না থাকলে বিশুদ্ধ সন্তান-সন্ততি জন্মে। স্ত্রীকে রক্ষার দ্বারা শিষ্টাচার রক্ষিত হয় এবং নিজের কুলমর্যাদা রক্ষিত হয়। স্ত্রীকে রক্ষা করলে নিজেকেও রক্ষা করা হয় এবং স্ত্রীকে রক্ষা করলে স্বামী তার নিজের ধর্মকেও রক্ষা করতে পারে। (৯/৭)।

তাই, কীভাবে স্ত্রীকে রক্ষা করতে হবে তার উপায়ও মনু বাতলে দিয়েছেন—

ন কশ্চিদ্‌যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিরক্ষিতুম্।
এতৈরুপায়যোগৈস্তু শক্যাস্তাঃ পরিরক্ষিতুম্॥

স্ত্রীলোকসমূহকে কেউ বলপূর্বক বা সংরোধ বা তাড়নাদির দ্বারা রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু বক্ষ্যমাণ উপায়গুলি অবলম্বন করলে তাদের রক্ষা করা যায়। (৯/১০)।

কী উপায়?

অর্থস্য সংগ্রেহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিযোজয়েৎ।
শৌচে ধর্মেঽন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্য বেক্ষণে॥

টাকাকড়ি ঠিকমতো হিসেব করে জমা রাখা এবং খরচ করা, গৃহ ও গৃহস্থালি শুদ্ধ রাখা, ধর্ম-কর্মসমূহের আয়োজন করা, অন্নপাক করা এবং শয্যাসনাদির তত্ত্বাবধান করা— এই সব কাজে স্ত্রীলোকদের নিযুক্ত করে অন্যমনস্ক রাখবে। (৯/১১)।

তারপরও রক্ষক পুরুষ এই স্বভাবদুষ্ট নারীকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। কেননা নারীকে কখনো বিশ্বস্ত ভাবা হয় না। তাই স্বভাব অনুযায়ী নারীর অবিশ্বস্ত বা দূষিত হওয়ার আরো কিছু কল্পিত কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা থেকে নারীকে নিরস্ত করার ব্যবস্থা নিতে হয়—

পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি ষট্॥

মদ্যপান, দুষ্ট লোকের সাথে মেলামেশা করা, স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো, অসময়ে ঘুমানো এবং পরের বাড়িতে বাস করা— এই ছয়টি বিষয় স্ত্রীলোককে দূষিত করে। (৯/১৩)।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

যে স্ত্রী দুঃশীলতাহেতু নিজে আত্মরক্ষায় যত্নবতী না হয়, তাকে আপ্তপুরুষেরা গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখলেও সে অরক্ষিতা হয়; কিন্তু যারা সর্বদা আপনা-আপনি আত্মরক্ষায় তৎপর, কেউ তাদের রক্ষা না করলেও তার সুরক্ষিতা হয়ে থাকে। (৯/১২)।

অতএব

যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধম্।
তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ॥

যে পুরুষ শাস্ত্রবিহিত উপায়ে নিজের পতি হয়েছে এমন পুরুষকে যে স্ত্রীলোক সেবা করে, সে উৎকৃষ্ট সন্তান প্রসব করে; আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ পরপুরুষ-সেবায় নিকৃষ্ট সন্তান লাভ হয়। সেই কারণে সন্তানের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য, সর্বপ্রযত্নে যাতে স্ত্রীর পরপুরুষ-সম্পর্ক না হয়, তার জন্য স্ত্রীকে সকল সময় রক্ষা করা কর্তব্য। (৯/৯)।

যাবতীয় দুষ্কর্মের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পুরুষই সব অঘটনের মূল ও সক্রিয়বাদী। তবু একপেশে পুরুষবাদে নারীকেই এর সমস্ত দায়ভাগ অন্যায়ভাবেই বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে মনুশাস্ত্র অন্ধ নয় অবশ্যই, দারুণরকম পক্ষপাতদুষ্ট ও আধিপত্যবাদী। ফলে সম্পত্তিসূচক স্ত্রীসংরক্ষণে প্রভুত্ববাদী মনুশাস্ত্র কখনোই হাল ছেড়ে দেয় নি তো বটেই, এবং একই কারণে স্ত্রীকে

কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগরহিত করে কেবল ভোগ্য থাকার নিমিত্তে নারীর কর্তব্যবিধান নির্দেশেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মনুশাস্ত্রে স্ত্রীর কর্তব্য

বিবাহ নামক নারী-সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত যে নারীটিকে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী পুরুষের ব্যক্তি-মালিকানায় রক্ষিতা বানানো হয়েছে, সেই নারীকে বহুমাত্রিক ভোগ-ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ণতৃপ্তি বা সন্তোষ না পেলে পুরুষতন্ত্রের সার্থকতা থাকে না। বর্ণ-নির্বিশেষে নারী সামাজিকভাবে শূদ্রধর্মিতার কারণেই শ্রম বা উৎপাদন-যন্ত্রবিশেষ, পুরুষের উপভোগ্য দেহধারণের কারণে নারী ভোগ্যসামগ্রী এবং গর্ভধারণকারী প্রজননযন্ত্রের কারণে নারী সন্তান উৎপাদনকারী জৈবযন্ত্র ইত্যাদি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাই এ ধরনের যাবতীয় প্রয়োজনের নিরিখে নারী যাতে কিছুতেই অব্যবহার্য না থাকে সে লক্ষ্যে মনুশাস্ত্র সদাসতর্ক থেকেছে সবসময়—

অপত্যং ধর্মকার্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥

সন্তানের উৎপাদন, অগ্নিহোত্রাদি ধর্মকর্ম সম্পাদন, পরিচর্যা, উত্তম রতি, পিতৃগণের এবং স্বামীর নিজের সন্তানের মাধ্যমে স্বর্গলাভ— এ সব কাজ পত্নীর দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। (৯/২৮)।

যেহেতু নারীমাত্রেই জৈবযন্ত্র হিসেবে বিবেচিত, তাই তাকে সর্বদাই সন্তান উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যেই রাখা উচিত। এজন্যেই মনুর নির্দেশ—

অনৃতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎ পতিঃ।
সুখস্য নিত্যং দাতেহ পরলোকে চ যোষিতঃ॥

পতি মন্ত্রের মাধ্যমে বিবাহ-সংস্কার করেন। তাই তিনি ঋতুকালেই হোক বা ঋতুভিন্ন কালেই হোক, ভার্যাতে গমন করবেন এবং এইভাবে তিনি স্ত্রীর ইহলোকে ও পরলোকে সকল সময়েই তার সুখপ্রদান করেন [যেহেতু পতির সাথেই স্ত্রীর ধর্মকর্ম করার অধিকার, আর তার ফলেই স্বর্গাদি ফল লাভ করা যায়, এই জন্য স্বামীকে স্ত্রীর 'পরলোকের সুখদাতা' বলা হয়েছে]। (৫/১৫৩)।

তবে

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ববর্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো রতিকাম্যয়া॥

ঋতুকালে অবশ্যই পত্নীর সাথে মিলিত হবে, সকল সময় পত্নীর প্রতি অনুরক্ত থাকবে; পত্নীর রতিকামনা হলে তা পূরণ করার জন্য (অমাবস্যা, অষ্টমী, পৌর্ণমাসী, চতুর্দশী প্রভৃতি) পর্বদিন বাদ দিয়ে ঋতুকাল ছাড়াও অন্য দিনে স্ত্রীর সাথে উপগত হতে পারবে। (৩/৪৫)।

এক্ষেত্রে নারীর স্বাভাবিক ঋতুকালও মনু কর্তৃক চিহ্নিত করা হয়েছে—

ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥

স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ঋতুকাল হলো (প্রতিমাসে) ষোল দিনরাত্রিব্যাপী। এগুলির মধ্যে (শোণিত-স্রাব-যুক্ত) চারটি দিন-রাত্রি সজ্জনগণকর্তৃক অতিশয় নিন্দিত। (৩/৪৬)।

তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ॥

ঐ ষোলটি রাত্রির মধ্যে প্রথম চারটি রাত্রি (প্রথম শোণিত দর্শন থেকে চারটি রাত্রি), ষোলটি রাত্রির মধ্যগত একাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যক রাত্রি— এই ছয়টি রাত্রি ঋতুমতী ভার্যার সাথে সঙ্গম নিন্দিত; এবং এ ছাড়া অবশিষ্ট দশটি রাত্রি প্রশস্ত। (৩/৪৭)।

এখানে প্রশস্ত দশটি রাত্রি চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট যে, সন্তান উৎপাদনের নিমিত্তেই নারীকে ব্যবহার করার নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। তবে পুত্রসন্তান উৎপাদনই যেহেতু পুরুষের প্রধান আগ্রহ, তাই আরেকটু সুনির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে—

যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেদার্তবে স্ত্রিয়ম্॥

ঐ দশটি রাত্রির মধ্যে যেগুলি যুগ্মরাত্রি সেগুলিতে অর্থাৎ ষষ্ঠী, অষ্টমী, দশমী, দ্বাদশী, চতুর্দশী ও ষোড়শী এই রাত্রিগুলিতে স্ত্রীগমন করলে পুত্রসন্তান জন্মে। আর পঞ্চমী, সপ্তমী, নবমী প্রভৃতি অযুগ্মরাত্রিগুলিতে স্ত্রীগমন করলে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। অতএব পুত্রলাভেচ্ছু ব্যক্তি ঋতুকালের মধ্যে যুগ্মরাত্রিতেই স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে। (৩/৪৮)।

অর্থাৎ পুরুষাধিপত্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে নির্দিষ্ট কতকগুলো দিনে ঘোষিত বিধিবিধান মোতাবেক যৌনক্রিয়ায় বাধ্য করা হচ্ছে তো বটেই, তবুও পুত্রসন্তানের জন্ম না হয়ে যদি কন্যা বা ক্লীব সন্তান জন্মে সেক্ষেত্রে অদ্ভুত কিছু কুযুক্তি আরোপ করে নারীকেই দায়ী করা হচ্ছে—

পুমান্ পুংসোহধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকে স্ত্রিয়াঃ।
সমেহপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বা ক্ষীণেহল্পে চ বিপর্যয়ঃ॥

মৈথুনকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে স্ত্রীগর্ভে শুক্রনিষেক করার পর পুরুষের রেতঃ ও স্ত্রীর গর্ভস্থ শোণিত (এই দুটিকে অর্থাৎ পুরুষের রেতঃ ও স্ত্রীলোকের গর্ভস্থ শোণিতকে 'শুক্র' বা বীর্য বলা হয়) যখন মিশ্রিত হয়ে যায়, তখন পুরুষের বীর্যাধিক্য হলে (শুক্রের আধিক্য কথাটির অর্থ পরিমাণত আধিক্য বা অধিক পরিমাণ নয়, কিন্তু সারত আধিক্য বুঝায়) অযুগ্ম রাত্রিতেও পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। আবার স্ত্রীর বীর্যাধিক্য হলে (অর্থাৎ স্ত্রীর গর্ভস্থ শোণিতভাগ সারত বেশি হলে) যুগ্ম রাত্রিতেও কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর যদি উভয়ের বীর্য (শুক্র ও শোণিত) সমান সমান হয় তাহলে অপুমান্ (নপুংসক) জন্মায় অথবা যমজ পুত্র-কন্যা জন্মায়। কিন্তু উভয়েরই বীর্য যদি ক্ষীণ অর্থাৎ অসার বা অল্প হয়, তাহলে বৃথা হয়ে যায়, গর্ভ উৎপন্ন হয় না। (৩/৪৯)।

রতিক্রিয়ায় পুত্র জন্মালে তা পুরুষেরই কৃতিত্ব। অন্যদিকে পুত্র না হয়ে ভিন্ন ফল হলে নারীর শারীরতাত্ত্বিক কুপ্রভাবই দায়ী বলে গণ্য হয়। এতে করে এই পুরুষতান্ত্রিক ভ্রষ্টদর্শনের দায় কাঁধে নিয়ে নারীকেই হীনম্মন্যতায় ভুগে পুরুষের নির্যাতন দণ্ড ভোগ করতে হয়। কেননা পুত্রদর্শনের অনিবার্যতায় শাস্ত্রবিধি পুরুষকে একাধিক দারপরিগ্রহে প্ররোচিত করে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, পুরুষের একাধিক স্ত্রী রাখা শাস্ত্রানুমোদিত থাকায় শাস্ত্রবিধির শুভঙ্করী হিসেবে পুরুষ ঘুরে ঘুরে কোনো না কোনো স্ত্রীর ঋতুকালের যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে গোটা মাসই রতিসুখ লাভ করলেও সর্বোচ্চ গুটিকয় দিন বাদে বাকি সময় একজন নারীর জৈবমানসিক চাহিদা অতৃপ্ত বা অস্বীকৃত থেকে যায়। অর্থাৎ তার যৌনস্বাধীনতাও এক্ষেত্রে বঞ্চিত বা অবহেলিত হয়। এরপরও স্ত্রীলোকের প্রতি মনুর উপদেশ বর্ষণে কার্পণ্য নেই—

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া॥

স্ত্রীলোক সকল সময়েই হৃষ্টচিত্ত হয়ে থাকবে, গৃহের কাজে দক্ষ হবে, গৃহসামগ্রীগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং অর্থব্যয়-বিষয়ে মুক্তহস্ত হবে না। (৫/১৫০)।

এবং শুধু স্বামীর মনোরঞ্জন এবং তাঁকে আকৃষ্ট করার জন্যেই স্ত্রীকে সেজেগুজে থাকতে হয়। কেননা—

যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে॥

শোভাজনক বস্ত্র-আভরণাদির দ্বারা যদি নারী দীপ্তিমতি না হয় (বা যদি তার তৃপ্তিবিধান না করা হয়), তাহলে সেই স্ত্রী পতিকে কোনও রকম আনন্দ দিতে পারে না। ফলে, স্ত্রী পতির প্রীতি জন্মাতে না পারলে সন্তানোৎপাদন সম্ভব হয় না। (৩/৬১)।

অর্থাৎ স্বামীর ইহলোক-পরলোকের মোক্ষলাভ করতে সন্তানোৎপাদনের দায়ও শেষপর্যন্ত নারীর ওপরই বর্তায়। কেননা সন্তান উৎপাদন না হলে বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে আকৃষ্ট করতে বা প্রীতি জন্মাতে না পারলে বা রুষ্ট হলে স্বামীটি যৌনতৃপ্তির খোঁজে পুনর্বিবাহ করে আরেকটি যৌনসম্পর্ক স্থাপন করবে।

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥

নারী বন্ধ্যা হলে আদ্য ঋতুদর্শন থেকে অষ্টম বৎসরে অন্য একটি বিবাহ করবে, মৃতবৎসা হলে দশম বৎসরে, কেবল কন্যাসন্তান প্রসব করতে থাকলে একাদশ বৎসরে এবং অপ্রিয়বাদিনী হলে সদ্য সদ্যই অধিবেদন করবে অর্থাৎ অন্য বিবাহ করবে। (৯/৮১)।

কী সাংঘাতিক কথা! নারীর এই অপ্রিয়বাদিতা যেহেতু কেবল স্বামী ব্যক্তিটির নিজস্ব রুচি বা মনোবাঞ্ছার ওপরই সম্পূর্ণত নির্ভরশীল, তাই নিশ্চিন্তে আশঙ্কামুক্ত হয়ে নারীর মানসিক স্থিরতা পাওয়ার বা দু'দণ্ড বিশ্রামের কোনো উপায় নেই। গৃহের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেও নারীকে সারাক্ষণই স্বামীদেবতার মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। একটু এদিক ওদিক হলেই যে স্বামী অন্য নারীর খোঁজে বেরিয়ে যাবে—

যা রোগিণী স্যাৎ তু হিতা সম্পন্না চৈব শীলতাঃ।
সানুজ্ঞাপ্যাধিবেত্তব্যা নাবমান্যা চ কর্হিচিৎ॥

স্ত্রী যদি রোগগ্রস্তা হয় অথচ শীলসম্পন্না এবং স্বামীর হিতকারিণী, তা হলে তার অনুমতি নিয়ে স্বামী অন্য বিবাহ করবে, তাকে কোনোক্রমেই অপমান করা চলবে না। (৯/৮২)।

কিন্তু নারীর সেরূপ কোনো যাবার জায়গা নেই। কেননা—

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতং চ ন লঙ্ঘয়েৎ॥

পিতা নিজে যাকে কন্যা সম্প্রদান করবেন অথবা পিতার অনুমতিক্রমে ভ্রাতা যার হাতে নিজ ভগ্নীকে সম্প্রদান করবে, সেই স্বামী যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন ঐ স্ত্রী তার শুশ্রূষা করবে এবং স্বামী সংস্থিত অর্থাৎ মৃত হলেও সে ব্যভিচারাদির দ্বারা বা শ্রাদ্ধতর্পণাদি না করে সেই স্বামীকে অবহেলা করবে না। (৫/১৫১)।

আবার স্বামী অধিবেদন অর্থাৎ আরেকটি বিয়ে করলেও পূর্ব-স্ত্রীর তা মেনে নেয়া ছাড়াও কোনো উপায় থাকে না—

অধিবিন্না তু যা নারী নির্গচ্ছেদ্দ্রুষিতা গৃহাৎ।
সা সদ্যঃ সন্নিরোদ্ধব্যা ত্যাজ্যা বা কুলসন্নিধৌ॥

অধিবেদন করা হয়েছে বলে যে স্ত্রী ক্রোধে গৃহ থেকে চলে যাবে তাকে তখনই গৃহমধ্যে আবদ্ধ করে রাখবে অথবা তার পিতা প্রভৃতি আত্মীয়ের নিকট রেখে আসবে। (৯/৮৩)।

সংবৎসরং প্রতীক্ষেত দ্বিষন্তীং যোষিতং পতিঃ।
ঊর্দ্ধং সংবৎসরাত্ত্বেনাং দায়ং হৃত্বা না সংবসেৎ॥

স্ত্রী যদি পতিদ্বেষিণী হয় তা হলে স্বামী তার জন্য এক বৎসর অপেক্ষা করবে। এক বৎসরের মধ্যে তার দ্বেষভাব বিগত না হলে তার অলঙ্কারাদি কেড়ে নিয়ে তার সাথে আর বসবাস করবে না। (৯/৭৭)।

এই রেখে আসা বা সাথে বসবাস না করার অর্থ এমন নয় যে তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অবহেলায় তাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী তার মালিকানা স্বামীপ্রভুটিরই থেকে যাচ্ছে। ফলে আত্মীয়দের গলগ্রহ হয়ে থাকলেও নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া তার শাস্ত্রীয় অধিকারে নেই। কেননা—

ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্তুর্ভার্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্মং বিজানমিঃ প্রাক্ প্রজাপতিনির্মিতম্॥

দান, বিক্রয়, বা পরিত্যাগের দ্বারা ভার্যা স্বামী থেকে সম্বন্ধচ্যুত হতে পারে না। প্রজাপতি-কর্তৃক এইরূপ ধর্মই সৃষ্টিকালে নির্দিষ্ট হয়েছে বলে আমরা জানি। (৯/৪৬)।

ফলে পুরুষতান্ত্রিকতার তীব্র যাতাকলে পরাধীন নারীকে এভাবে প্রতিনিয়ত পর্যুদস্ত হয়েই থাকতে হয়। ফলে যা কিছুই ঘটুক না কেন, স্বামীসেবাই হয়ে যায় আমৃত্যু নারীর পরম ধর্ম—

বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈ র্বা পরিবর্জিতঃ।
উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥

স্বামী বিশীল (অর্থাৎ জুয়াখেলা প্রভৃতিতে আসক্ত এবং সদাচারশূন্য), কামবৃত্ত (অর্থাৎ অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত) এবং শাস্ত্রাধ্যায়নাদি ও ধনদানাদি গুণবিহীন হলেও সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য হলো স্বামীকে দেবতার মতো সেবা করা। (৫/১৫৪)।

এবং সাধ্বী স্ত্রী কাকে বলা হয় তাও মনুশাস্ত্রে স্পষ্ট করে দেয়া আছে—

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্‌দেহসংযতা।
সা ভর্তৃলোকানাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥

যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযত থেকে পতিকে অতিক্রম করে না, সে ভর্তৃলোকে গমন করে এবং সাধুলোকেরা তাকে 'সাধ্বী' বলে প্রশংসা করে। (৫/১৬৫)।

তাই

পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোকমভীপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥

সাধ্বী স্ত্রী যদি পতিলোক [অর্থাৎ পতির সাথে ধর্মানুষ্ঠান করে যে স্বর্গাদি লোক অর্জন করা যায়, সেই পতিলোক] লাভ করতে ইচ্ছা করে, তাহলে যে ব্যক্তি তার পাণিগ্রহণ করেছে তার জীবিতকালেই হোক বা তার মৃত্যুর পরেই হোক তার কোনও অপ্রিয় কাজ সে করবে না। (৫/১৫৬)।

এখানে হয়ত কূট-প্রশ্নের সুযোগ রয়েছে যে, স্ত্রী যদি নিতান্তই বর্তমান বিশীল বা কামবৃত্ত পতির প্রতি অনাগ্রহহেতু পতিলোক লাভে ইচ্ছুক না হয়? এরকম প্রশ্ন বৈদিক সমাজে প্রযোজ্য হওয়ার কোনো সুযোগই নেই আসলে। কেননা নারীর নিজস্ব কোনো ইচ্ছা থাকতে পারে তা পিতৃতান্ত্রিক মনুশাস্ত্রে সম্পূর্ণতই অস্বীকার করা হয়েছে। পুরুষের অনুগামী হওয়াই নারীর জন্য অনিবার্য ও বাধ্যতামূলক। তবে একজন নারীর জন্য এই অনুগামিতাও কেবল একজন পুরুষের দিকেই, যিনি তার পতি হবেন। সেই পতিদেবটি যদি বিশীল কিংবা সন্তানদানে অক্ষমও হয়, তবুও নারীর তাকে ছেড়ে যাবার উপায় নেই—

অপত্যলোভাদ্ যা তু স্ত্রী ভর্তারমতিবর্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥

যে স্ত্রী সন্তানের লোভে স্বামীর অতিবর্তন করে অর্থাৎ স্বামীকে লঙ্ঘন করে এবং পরপুরুষের সাথে সংসর্গ করে, সে ইহলোকে নিন্দা বা লোকাপবাদ প্রাপ্ত হয় এবং পরলোক থেকেও বঞ্চিত হয় (অর্থাৎ স্বর্গলাভ করতে পারে না)। (৫/১৬১)।

নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্তোপদিশ্যতে॥

(নিয়োগপ্রথা ব্যতিরেকে) পরপুরুষের দ্বারা উৎপাদিত সন্তান কোনও নারীর নিজসন্তান হতে পারে না; সেইরকম যে নারী নিজের পত্নী নয় তার গর্ভে উৎপাদিত পুত্রও কোনও পুরুষের নিজপুত্র হতে পারে না। সাধ্বী স্ত্রীদের দ্বিতীয় পতিগ্রহণের উপদেশ নেই। (৫/১৬২)।

তাই পতি মারা গেলেও স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে—

কামং তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥

পতি মৃত হলে স্ত্রী বরং পবিত্র ফুল-ফল-মূলাদি অল্পাহারের দ্বারা জীবন ক্ষয় করবে, কিন্তু ব্যভিচারবুদ্ধিতে পরপুরুষের নামোচ্চারণও করবে না। (৫/১৫৭)।

অর্থাৎ নারীর সহজাত মাতৃত্বসত্তার স্বীকার তো দূরের কথা, তার কোনো জৈবিক চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে, মনুশাস্ত্রে তাও স্বীকৃত হয় নি। কেননা মনুশাস্ত্রে নারীর দ্বিতীয় পতিগ্রহণের উপদেশ নেই। অথচ পুরুষের কামচরিতার্থতার প্রয়োজনকে কিন্তু কোনোভাবেই অস্বীকার করা হচ্ছে না। বরং পুরুষের জন্য পবিত্র বিধানও তৈরি করে দেয়া হয়েছে—

ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥

(সুশীলা—) ভার্যা স্বামীর পূর্বে মারা গেলে তার দাহাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করে পুরুষ পুনরায় দারপরিগ্রহ ও অগ্ন্যাধ্যান করবে (যদি ধর্মানুষ্ঠান ও কামচরিতার্থতার প্রয়োজন থাকে, তবেই ঐ স্বামীর পুনরায় দারপরিগ্রহ করা উচিত। তা না হলে পত্নী নেই বলে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস অবলম্বন করতে পারে)। (৫/১৬৮)।

অনেন বিধিনা নিত্যং পঞ্চযজ্ঞান্ ন হাপয়েৎ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥

পূর্বোক্ত বিধানানুসারে কোনও সময়ে পঞ্চযজ্ঞ পরিত্যাগ করবে না এবং দারপরিগ্রহ করে পরমায়ুর দ্বিতীয়ভাগে গৃহাশ্রমে বাস করবে। (৫/১৬৯)।

আবার বৈদিক সমাজে নারী অত্যন্ত সহজলভ্য বলেই নারীর প্রতি পুরুষতন্ত্র কতটা অবহেলাপরায়ণ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে তার নমুনাও মনুশাস্ত্রে বিরল নয়—

বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ॥

স্বামী যদি গ্রাসাচ্ছাদনাদির ব্যবস্থা করে দিয়ে বিদেশে বসবাস করতে যায়, স্ত্রীর কর্তব্য হবে— নিয়ম অবলম্বন করে থাকা [যেমন, স্বামী কাছে থাকলে পরের বাড়িতে গিয়ে থাকা প্রভৃতি স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ, তেমনি স্বামী প্রোষিত হলেও ঐ সব নিয়ম গ্রহণ করে কালাতিপাত করবে], আর যদি বৃত্তির ব্যবস্থা না করেই স্বামী বিদেশে অবস্থান করে, তাহলে সূতা কাটা প্রভৃতি অনিন্দিত শিল্পকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে। (৯/৭৫)।

প্রোষিতো ধর্মকার্যার্থং প্রতীক্ষ্যোহষ্টৌ নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড়্যশোহর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্॥

স্বামী যদি ধর্মকার্যের জন্য বিদেশে গিয়ে বাস করে তা হলে আট বৎসর, বিদ্যার্জনের জন্য বিদেশে গেলে ছয় বৎসর, যশোলাভের জন্য গেলে ছয় বৎসর এবং কামোপভোগের জন্য বিদেশ গেলে তিন বৎসর স্ত্রী তার জন্য অপেক্ষা করবে। (৯/৭৬)।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই অপেক্ষা পূর্ণ হবার পর নারীর কর্তব্য কী হবে? এখানে মনু উত্তরহীন হলেও অন্যত্র এই কর্তব্যবিধান দেয়াই আছে। যেহেতু নারীর পুনর্বিবাহ বৈধ নয়, যেহেতু নারীর পরপুরুষের চিন্তা করাও নিষিদ্ধ এবং যেহেতু নারীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক গন্তব্য হিসেবে একজন স্বামীই নির্দেশিত, তাই ধরেই নিতে হয় যে একজন স্বামীদেবতার তিলকচিহ্ন ধারণ করে নারীটি আসলে পরিত্যক্তাই। এবং স্পষ্টতই তার গন্তব্য বিধান-নির্দিষ্ট পথেই। অথচ যে স্বামীটি কর্তৃক এই নারী পরিত্যক্তাবস্থায় নিক্ষিপ্ত হলো, হয়ত সেই স্বামীদেবতা বিদেশে তখন শাস্ত্রবিধি অনুসারেই আরো একাধিক স্ত্রী নিয়ে লীলায় মত্ত রয়েছে।

মোটকথা মনুশাস্ত্রে নারী শুধু ভোগ্য ও ব্যবহার্যই কেবল, কিন্তু কোনো ইতিবাচক ফলাফলের অধিকারিণী সে নয়। সেখানে পুরুষই কর্তৃত্বপরায়ণ। আর এই পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রশ্নহীন ও যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্যেই নিরূপায় নারী যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই নারীর পরম ধর্ম ও কর্তব্য হিসেবে কীর্তিত হয়েছে কেবল।

মনুশাস্ত্রে নারীর গুরুত্ব ও ব্যবহার

পুরুষের দৃষ্টিতে যা কিছু নেতি বা নিকৃষ্ট তারই উৎস হিসেবে নারীকে মনুশাস্ত্রে যথেচ্ছভাবে হীন খলচরিত্রে উপস্থাপন ও চিহ্নিত করা হলেও সমাজজীবনে নারীর উপস্থিতির অবশ্যম্ভাবিতার কারণে তাকে গুরুত্ব না-দিয়েও উপায় নেই পুরুষের। কিন্তু তাও হয়েছে পুরুষের অনুকূলে, উদ্দেশ্যমূলক—

পতির্ভার্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥

পতি শুক্ররূপে ভার্যার গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করে এই পৃথিবীতে তার গর্ভ থেকে পুনরায় পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। জায়ার (অর্থাৎ ভার্যার) জায়াত্ব এই যে তার মধ্যে পতি পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে এবং এই কারণেই ভার্যাকে জায়া বলা হয়। অতএব জায়াকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে হবে। (৯/৮)।

কিন্তু এ কথার আড়ালে মনুর অন্তর্গত পুরুষতান্ত্রিক প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে একরৈখিক—

পৌংশ্চলাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈঃস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোহপীহ ভর্তৃষবেতা বিকুর্বতে॥

যেহেতু স্ত্রীলোক স্বভাবত পুংশ্চলী [যে কোনও পুরুষ মানুষ এদের দৃষ্টি-পথে পড়লে এদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে— ঐ পুরুষের সাথে কীভাবে সম্ভোগ করবো— এই প্রকার যে চিত্তবিকার, তাই পুংশ্চলিত্ব], চঞ্চলচিত্ত [ধর্মকার্যাদি শুভ-বিষয়ে চিত্তের অস্থিরতা দেখা যায়] এবং স্নেহহীন, সেই কারণে এদের যত্নসহকারে রক্ষা করা হলেও এরা স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়ে থাকে। (৯/১৫)।

পিতৃতন্ত্র যে প্রকৃতপক্ষেই নারীর মর্যাদা দিতে জানে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য স্ত্রী যেখানে আক্ষরিক অর্থেই শ্রমদাসী বা সেবাদাসী, সেখানে মর্যাদার প্রশ্নও প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়। তাই স্ত্রীকে কখনো বন্ধুভাবাপন্ন ভাবা মনুশাস্ত্রের বিধান নয়, বরং কর্তব্যে অবহেলাজনিত অপরাধ করলে স্পষ্ট করে প্রহাররূপ শাসনের কথাই নির্দেশ করা হয়েছে—

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যূ রজ্জ্বা বেণুলেন বা॥

স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, শিষ্য এবং কনিষ্ঠ সহোদরভ্রাতা অপরাধ করলে সূক্ষ্ম দড়ির দ্বারা কিংবা বেতের দ্বারা শাসনের জন্য প্রহার করবে। (৮/২৯৯)।

এখানে স্ত্রীকে পুত্র, শিষ্য বা ভৃত্যের পর্যায়ে দেখার অর্থই হচ্ছে নারী শেষপর্যন্ত দাসীই। তবে তা সাধারণ দাসী নয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ দাসী। এবং পুরুষ হচ্ছে তার সর্বত্রগামী প্রভু। এই সর্বত্রগামী প্রভুত্ব কায়েম রাখার স্বার্থেই নারীকে এক ধরনের গুরুত্বও দেয়া হয়েছে বৈ কি—

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন॥

স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসব ও পালন করে বলে ['প্রজন' বলতে গর্ভধারণ থেকে সন্তান পালন পর্যন্ত ক্রিয়াকলাপকে বোঝায়] তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী [এ কারণে, তারা বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদানের দ্বারা বহুসম্মানের যোগ্য]; এরা গৃহের দীপ্তি অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ হয় [স্ত্রীলোক বাড়িতে না থাকলে কুটুম্ব বা আত্মীয়বর্গের আদর-আপ্যায়ন কিছুই হয় না। পুরুষের ধনৈশ্বর্য থাকলেও যদি ভার্যা না থাকে, তা হলে বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনেরা উপস্থিত হলে গৃহস্বামী নিজে তাদের প্রত্যেককে পান-ভোজনাদির দ্বারা আপ্যায়িত করতে পারে না] এই কারণে, স্ত্রীলোকদের সকল সময়ে সম্মান-সহকারে রাখা উচিত, বাড়িতে স্ত্রী এবং শ্রী— এদের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। (৯/২৬)।

তাই

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

যে বংশে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালঙ্কারাদির দ্বারা পূজা বা সমাদর প্রাপ্ত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন (আর প্রসন্ন হয়ে তাঁরা পরিবারের সকলকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন), আর যে বংশে স্ত্রীলোকদের সমাদর নেই, সেখানে (যাগ, হোম, দেবতার আরাধনা প্রভৃতি) সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়ে যায়। (৩/৫৬)।

কিন্তু নারীর এ সমাদর যে স্বার্থহীন নয়, মনুশাস্ত্রে তা অস্পষ্ট নয়। কেননা পুরুষের স্বার্থ বিন্দুমাত্র ব্যাহত হলে কীভাবে রক্ষিতা স্ত্রীটি নিমেষে পরিত্যাজ্য হয়ে যায় তা আমরা আগেই দেখেছি। পুরুষের এই স্বার্থ হচ্ছে শর্তহীন ভোগ ও সম্পদ রক্ষার নিমিত্তে উত্তরাধিকারী উৎপাদনের স্বার্থ। এগুলো যথাযথ পূর্ণ করার মধ্যেই মূলত নারীর গুরুত্ব নিহিত। এ উভয় স্বার্থেই পুরুষ স্পষ্টতই আপোষহীন, কোথাও ছাড় দিতে নারাজ। একটি মনোদৈহিক সন্তুষ্টি, অন্যটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রিকত্ব। তাই ভোগের স্বার্থ পূর্ণ না হলে যেমন নারীর কোনো মূল্যই নেই, তেমনি পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার উৎস পুত্র জন্ম দিতে না পারলেও সে নারীর আর সমাদর থাকে না। পুত্রের মাধ্যমেই পুরুষের বংশধারা রক্ষিত হয় এবং পুত্রের মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানাও পুরুষের অধীনস্থ থাকে। আর এই পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার ধারা বহাল রাখতে নারীকে তার সর্বস্বের বিনিময়েই পুত্র উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ ব্যস্ত থাকতে হয়। যদিও পুত্রের ওপর মাতার কোনো অধিকার নেই। তবু এটাই তার অস্তিত্বের প্রশ্ন। এবং অনুধাবনের বিষয় যে, এটা পিতৃতন্ত্রেরও অস্তিত্বের প্রশ্ন। সে কারণেই পতি অক্ষম হলে কিংবা সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে বংশধারা রক্ষাকল্পে সমস্ত মুখোশ ছিঁড়ে ফেলেও পিতৃবংশ উন্মত্ত হয়ে ওঠে স্ত্রী কিংবা বিধবার গর্ভে পুত্র জন্মানোর নিমিত্তে এক ধরনের নিয়োগ-প্রথার মাধ্যমে—

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥

সন্তানের পরিক্ষয়ে অর্থাৎ সন্তান-উৎপত্তি না হওয়ায় বা সন্তান-জন্মানোর পর তার মৃত্যু হওয়ায় বা কন্যার জন্ম হলে তাকে পুত্রিকারূপে গ্রহণ না করায় নারী শ্বশুর-শাশুড়ি-পতি প্রভৃতি গুরুজনদের দ্বারা সম্যকভাবে নিযুক্ত হয়ে দেবর (অর্থাৎ স্বামীর জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা) অথবা সপিণ্ডের (স্বামীর বংশের কোনও পুরুষের) সাহায্যে অভিলষিত সন্তান লাভ করবে। (৯/৫৯)।

বৈদিক বিধান এমনই অলৌকিক শাস্ত্র যে সম্পদরক্ষায় পুত্রের প্রয়োজনে মনুসংহিতার ৫/১৫৭ সংখ্যক শ্লোকে (ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত) বর্ণিত বিধবার কর্তব্যও সাময়িক রদ হয়ে যায়—

সংস্থিতস্যানপত্যস্য সগোত্রাৎ পুত্রমাহরেৎ।
তত্র যদ্ রিক্থজাতং স্যাত্তত্তস্মিন্ প্রতিপাদয়েৎ॥

কোনও ব্যক্তি যদি অপুত্র অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার স্ত্রী গুরুজনদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে সগোত্র পুরুষের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করবে এবং মৃত ব্যক্তির যা কিছু ধনসম্পত্তি তা ঐ পুত্রকে অর্পণ করবে। (৯/১৯০)।

কীভাবে এই নিয়োগ-প্রথাটি কার্যকর করা হবে মনুশাস্ত্রে তাও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে—

বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥

বিধবা নারীতে অথবা অক্ষম পতি থাকা সত্ত্বেও সধবাতেও পতি-প্রভৃতি গুরুজনের দ্বারা নিযুক্ত দেবর বা কোনও সপিণ্ড ব্যক্তি ঘৃতাক্ত শরীরে মৌনাবলম্বন করে রাত্রিতে একটিমাত্র পুত্র উৎপাদন করবে, কখনো দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদন করবে না [নিশি অর্থাৎ রাত্রিতে কথাটি বলার তাৎপর্য হলো, সেখানে প্রদীপ প্রভৃতি আলো থাকবে না]। (৯/৬০)।

অতঃপর

বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্বৃতে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্তেয়াতাং পরস্পরম্॥

বিধবা নারীতে যথাবিধি নিয়োগের প্রয়োজন সিদ্ধ হলে [যে কারণে নিয়োগ করা হয়, তা-ই এখানে নিয়োগের বিষয়। তা হলো স্ত্রী-পুরুষের সম্প্রযোগ থেকে ক্রিয়ানিষ্পত্তি অর্থাৎ স্ত্রী-লোকের গর্ভধারণ পর্যন্ত] উভয়ের মধ্যে পূর্ববৎ আচরণই চলতে থাকবে। সেটি হলো গুরুবৎ স্নুষাবৎ; অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে ঐ নারী যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী হয় তা হলে তার প্রতি গুরুর মতো, আর যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী হয়, তাহলে তার প্রতি পুত্রবধূর মতো আচরণ করবে। (৯/৬২)।

বড়ো অদ্ভুত বিধান! পরস্পর নিবিড় যৌনসংসর্গের অভিজ্ঞতায় পৌঁছেও কোনোরূপ আবেগ বা কামনাহীন এমন যান্ত্রিক আচরণবিধি পালনের নির্দেশ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, পিতৃতন্ত্রে মানবীয় আবেগ-অনুভূতির কোনো স্থান নেই। আর নারী সেখানে আক্ষরিক অর্থেই শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। সম্পদ রক্ষার্থে পিতৃতন্ত্রের এই নিয়োগপ্রথার বৈধতা নিরূপণ করেও আবার কূটাভাষের মাধ্যমে তাকে প্রতিষেধ করারও চেষ্টা করা হয়েছে—

নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্মং হন্যুঃ সনাতনম্॥

বিধবা নারীকে দ্বিজাতিগণ কখনো অন্য পুরুষে নিযুক্ত করবে না, কারণ, অন্য পুরুষে যারা ঐ ভাবে তাকে নিযুক্ত করে, তারা সনাতন ধর্ম উল্লঙ্ঘন করে। (৯/৬৪)।

কীভাবে উল্লঙ্ঘন হয়?

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥

বিবাহবিষয়ক যে সব মন্ত্র আছে তার কোথাও নিয়োগের প্রসঙ্গ নেই [অর্থাৎ বিবাহসম্পর্কিত যত সব মন্ত্র আছে সেগুলি প্রত্যেকটিতেই বিবাহকারীর নিজেরই উৎপাদিত সন্তানের কথা বলা আছে] আর বিবাহবিষয়ক-শাস্ত্রেও বিধবা-আবেদনের অর্থাৎ বিধবাবিবাহের বা বিধবা-গমনের কথা নেই। (৯/৬৫)।

অর্থাৎ নিয়োগবিধি উল্লেখ করে ধর্মীয় বিধানে তাকে আবার যতটুকু সম্ভব নিরুৎসাহিত করার কৌশলী বিভ্রম ছড়িয়ে মূলত সম্পদরক্ষায় নারীকে ব্যবহার ও ভোগের ভিন্ন একটি উপায়ের পেছনদরজা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব, নারীর অবস্থা তথৈবচ। মূলত প্রচলিত সামাজিক প্রথা হিসেবে নিয়োগবিধির আলোকে বিধবাবিবাহের মাধ্যমে নারীর পুনর্বিবাহ প্রতিরোধকল্পেই এই বিভ্রান্তি পিতৃতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট বলে মনে হয়। অন্যদিকে পিতৃতন্ত্রে সম্পদরক্ষারও কী অদ্ভুত উপায়!

আবার বিবাহের আগে যে বাগদত্তা কন্যার বরের মৃত্যু হয় এবং শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যেহেতু তাকে অন্যত্র সম্প্রদান করা যায় না (৯/৭১), তার ক্ষেত্রেও ভিন্ন নিয়োগপ্রথার উল্লেখ মনুশাস্ত্রে দেখা যায়—

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ॥

বিবাহের আগে কোনও বাগদত্তা কন্যার বরের মৃত্যু হলে, নিম্নোক্ত বিধান অনুসারে বরের সহোদর ভ্রাতা তাকে বিবাহ করবে। (৯/৬৯)।

যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেতাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥

উক্ত দেবর কন্যাটিকে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে বিবাহ করে তাকে গমনকালীন নিয়মানুসারে বৈধব্যচিহ্নসূচক-শুক্লবস্ত্র পরিয়ে এবং কায়মনোবাক্যে তাকে শুদ্ধাচারিণী রেখে প্রত্যেক ঋতুকালে তাতে এক এক বার গমন করবে যতদিন না সে গর্ভধারণ করে। (৯/৭০)।

ন্যূনতম মানবিক অধিকারও হরণের মাধ্যমে নিরূপায় বানিয়ে নারীনিবর্তনের এমন নির্মম নজির কেবল পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী সমাজ ও ধর্মশাস্ত্রেই সম্ভব।

সম্পদে ও উত্তরাধিকারে অধিকাররহিত নারী

সম্পত্তির অধিকারই অর্থনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু। আর পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকাঠামোয় এই অধিকার সম্পূর্ণই পিতার। পিতার বর্তমানে পুত্রেরাও সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। কেবল পিতার মৃত্যুর পরই পুত্রেরা সম্পত্তির মালিক হতে পারে। আর এ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান বহু বহু দূরে—

ঊর্দ্ধং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমম্।
ভজেরন্ পৈতৃকং রিক্থমনীশাস্তে হি জীবতোঃ॥

পিতা এবং মাতার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা সমবেত হয়ে পিতা এবং মাতার ধন বিভাগ করে নেবে, কারণ, তাঁরা জীবিত থাকতে পুত্রদের কোনও স্বামিত্ব বা অধিকার নাই। (৯/১০৪)।

ধর্মানুসারে জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্মজ এবং অন্য সন্তানেরা কামজ (৯/১০৭) এবং জ্যেষ্ঠই জন্মমাত্র পিতৃঋণ পরিশোধ করে বলে জ্যেষ্ঠপুত্রই প্রকৃত অর্থে পুত্রপদবাচ্য (৯/১০৬)। তাই সম্পত্তির দায়ভাগ বিধান মতে জ্যেষ্ঠই সমস্ত পিতৃধন লাভ করার যোগ্য। অতঃপর—

জ্যেষ্ঠস্য বিংশ উদ্ধারঃ সর্বদ্রব্যাচ্চ যদ্বরম্।
ততোঽর্দ্ধং মধ্যমস্য স্যাৎ তুরীয়ন্তু যবীয়সঃ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার ধন সম্পত্তির বিশ ভাগের এক ভাগ 'উদ্ধার' অর্থাৎ অতিরিক্ত পাবে, এবং সকল দ্রব্যের মধ্যে যেটি সেরা সেটিও পাবে। মধ্যম তার অর্দ্ধেক অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ 'উদ্ধার' পাবে আর কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের চতুর্থ ভাগ অর্থাৎ সমগ্র ধন-সম্পত্তির আশি ভাগের এক ভাগ ঐ 'উদ্ধার' পাবে। (৯/১১২)।

স্বেভ্যোঽংশেভ্যস্তু কন্যাভ্যঃ প্রদদ্যুর্ভ্রাতরঃ পৃথক্।
স্বাৎ স্বাদংশাচ্চতুর্ভাগং পতিতাঃ স্যুরদিৎসবঃ॥

ভ্রাতারা স্বজাতীয় অবিবাহিত ভগিনীগণকে নিজ নিজ অংশ থেকে চতুর্থ ভাগ ধন পৃথক করে দান করবে; যদি তারা দিতে অনিচ্ছুক হয় তা হলে পতিত হবে। (৯/১১৮)।

অর্থাৎ বিবাহিত ভগিনীরা পিতৃসম্পত্তির অধিকারী নয়।

সম্পত্তির মালিকানা বা উত্তরাধিকারের জন্য পুত্র থাকা অনিবার্য বলেই যদি পুত্র না থাকে, সেক্ষেত্রে পিতা বিকল্প উপায় হিসেবে তার কন্যাকে 'পুত্রিকা' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্বাচন করতে পারেন—

অপুত্রোহনেন বিধিনা সুতাং কুর্বীত পুত্রিকাম্ ।
যদপত্যং ভবেদস্যাং তন্মম স্যাৎ স্বধাকরম্॥

যে লোকের কোনও পুত্র সন্তান নেই সে এই বক্ষ্যমাণ নিয়মে নিজের কন্যাকে 'পুত্রিকা'রূপে স্থির করবে । কন্যাকে পাত্রস্থ করবার সময় ঐ কন্যার পিতা জামাতার সাথে বন্দোবস্ত করে এই কথা তাকে বলবে— 'এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মাবে সে আমার পিণ্ডদানকারী হবে' । (৯/১২৭) ।

উল্লেখ্য যে, শাস্ত্রানুযায়ী পুত্রের প্রয়োজন হয় পিতৃপুরুষের আত্মার মুক্তি বা সদগতির লক্ষ্যে (স্বর্গারোহণ) শ্রাদ্ধাতিতে পিণ্ডদান করার জন্য (৯/১৩৭) । পিণ্ডদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে মূলত অন্যান্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায় । একইভাবে পিণ্ডদানের অধিকারক্রম অনুযায়ীই সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ধারাক্রম নির্ধারিত হয় । তাই কন্যার প্রতি দায় বা মমত্ব থেকে পিতৃতন্ত্র পুত্রিকা গ্রহণ করে তা ভাবার কোনও সুযোগ নেই । বরং উত্তরাধিকারের সংকটমুক্তির লক্ষ্যে এখানে পুত্রিকার পুত্রকেই নিজ-পুত্র কল্পনা করার প্রকৃত মনোভাব হিসেবে কাজ করে । কেননা—

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা ।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ॥

নিজেও যেমন পুত্রও সেইরকম অর্থাৎ আত্মা ও পুত্রতে প্রভেদ নেই; আবার দুহিতা অর্থাৎ 'পুত্রিকা' পুত্রেরই সমান । সেই পুত্রিকা-পুত্র স্বয়ং বিদ্যমান থাকতে অন্য কোনও ব্যক্তি ঐ পুত্রিকা-পিতার ধন কেমনভাবে গ্রহণ করবে? (৯/১৩০) ।

আবার

পুত্রিকায়াং কৃতায়াম্ত্ত যদি পুত্রোহনুজায়তে ।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাজ্জ্যেষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়াঃ॥

পুত্রিকা সম্পাদন করার পর যদি কোনও ব্যক্তির পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহলে পুত্র ও পুত্রিকা উভয়ের মধ্যে সমান-সমানভাবে ধনবিভাগ হবে । কারণ, স্ত্রীলোকের জ্যেষ্ঠতা নেই অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপুত্র যে 'উদ্ধার' পেত তা ঐ পুত্রিকা পাবে না । (৯/১৩৪) ।

এতেই প্রতীয়মান হয় যে পিতৃতন্ত্র আসলে পুত্রমুখীই । তাছাড়া পুত্রিকা গ্রহণে পিতৃবংশধারা রুদ্ধ হবার সংশয়ও ত্যাগ করা যায় না—

অপুত্রায়াং মৃতায়াম্ত্ত পুত্রিকায়াং কথঞ্চন ।
ধনং তৎপুত্রিকাভর্তা হরেতৈবাবিচারয়ন্॥

পুত্রিকা যদি অপুত্রক অবস্থায় ঘটনাক্রমে মারা যায়, তাহলে ঐ পুত্রিকার যা কিছু ধন-সম্পত্তি তা তার ভর্তাই বিনা-বিচারে গ্রহণ করবে । (৯/১৩৫) ।

এই সংশয় থেকেই, কিংবা ব্যক্তি সন্তানহীন হলে, সামাজিক নিয়োগ-প্রথায় দেবর বা অপর পুরুষের মাধ্যমে যথাবিহিত পুত্র উৎপাদনের মধ্য দিয়ে এই উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করে সম্পত্তি-রক্ষার সংকট নিরসন করা হয়—

হরেত্তত্র নিযুক্তায়াং জাতঃ পুত্রো যথৌরসঃ ।
ক্ষেত্রিকস্য তু তদ্বীজং ধর্মতঃ প্রসবশ্চ সঃ॥

গুরুজনদের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে যদি কোনও স্ত্রী বিধানানুসারে সন্তানোৎপাদন করে, তাহলে ঐ পুত্র ঔরসপুত্রের মতো পৈত্রিকধন প্রাপ্তির যোগ্য হবে, কারণ শাস্ত্রব্যবস্থা অনুসারে সেই নারীর গর্ভে যে বীজ নিষিক্ত হয়েছিল, তা ক্ষেত্রস্বামীরই বীজ বলে গণ্য হবে এবং সেই পুত্রটিও ক্ষেত্রস্বামীরই অপত্য হবে । (৯/১৪৫) ।

কিন্তু তা গুরুজন কর্তৃক আদিষ্ট না-হয়ে কিংবা যথাবিহিত নিয়ম ব্যতিরেকে হলে উৎপাদিত সন্তান কামজ ও জারজ বলে গণ্য হওয়ায় সম্পত্তির অধিকারী হবে না । অতএব যথানিয়মে ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মালে তার ক্ষেত্রে সম্পত্তি বণ্টন হবে—

যবীয়ান্ জ্যেষ্ঠভার্যায়াং পুত্রমুৎপাদয়েদ্ যদি ।
সমস্তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ॥

কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীতে পুত্রসন্তান উৎপাদন করে, তা হলে সেই পুত্রের এবং তার পিতৃব্যের মধ্যে সমান সমান বিভাগ হবে, এটিই ধর্ম ব্যবস্থা । (৯/১২০) ।

দায়ভাগ বিধানের উপর্যুক্ত বণ্টনপ্রক্রিয়া মূলত পূর্বে ধনবিভাগকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় । কিন্তু পূর্বে ধনবিভাগ না করেই যদি কোনও ভ্রাতার মৃত্যু হয়, তাহলে মনুর বিধান হচ্ছে—

ধনং যো বিভৃয়াদ্ ভ্রাতুর্মৃতস্য স্ত্রিয়মেব চ ।
সোহপত্যং ভ্রাতুরুৎপাদ্য দদ্যাত্তস্যৈব তদ্ ধনম্॥

(পূর্বে ধনবিভাগ না করেই) যদি কোনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্ত্রী রেখে পুত্ররহিত অবস্থায় মারা যায় এবং ঐ মৃত ভ্রাতার বিভক্ত ধনসম্পত্তি যদি পত্নী রক্ষা করতে অসমর্থ হয়, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি ঐ সম্পত্তি রক্ষা করে এবং ভ্রাতৃপত্নীকে পোষণ করে, তাহলে ঐ কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়াতে পুত্রোৎপাদন পূর্বক জ্যেষ্ঠভ্রাতার সমস্ত সম্পত্তি ঐ পুত্রটিকে দেবে। (৯/১৪৬)।

এ সব কিছু মিলিয়ে মানে দাঁড়াল একটাই যে, কোনোভাবেই পারিবারিক সম্পত্তি তথা ক্ষমতা হাতছাড়া করা যাবে না, তাই যেকোনোভাবে পুত্র চাই। পুত্রই পিতৃতন্ত্রের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। প্রয়োজনে ভ্রাতৃজায়াতেও পুত্র উৎপাদন করিয়ে নেয়াটাকেও বৈধ করা হয়েছে পারিবারিক, সামাজিক তথা অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন হিসেবে। তাই অদ্ভুতভাবে এই বিশেষ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্ককে কাম-নিরপেক্ষতার আবরণ দেয়া হয়েছে। কেননা কামজ হলেই সম্পত্তিতে অধিকারহীনতার নির্দেশনা। ক্ষমতার এই কেন্দ্রিকতায় নারী কার্যকরভাবেই অনুপস্থিত। নারীর উপস্থিতি এখানে শুধু পুরুষের নৈতিক-অনৈতিক ইচ্ছার ক্রীড়নক হয়ে পুত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত হওয়া। যদিও এই নৈতিক বা অনৈতিকতার মানদণ্ডও নির্ধারিত হয়েছে পিতৃতন্ত্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে, যা একান্তই উদ্দেশ্যমূলক ও আধিপত্যবাদী। তবে এখানেই শেষ নয়।

মনুশাস্ত্রে যেহেতু পুরুষের একাধিক বিয়ের স্বীকৃতি বিদ্যমান, সেক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বিদ্যমান থাকলে আরো কিছু বিষয়ও এসে যুক্ত হয় তখন। এবং যদি তারা হয় একাধিক বর্ণের, তবে জটিলতা আরো বেড়ে যায়। ফলে বর্ণাশ্রমের মৌলিক নীতি অনুযায়ী অনিবার্যভাবেই স্ত্রীর জ্যেষ্ঠতা ও বর্ণের স্তরভেদ অনুসারে উৎপাদিত সন্তানের উত্তরাধিকার বা সম্পত্তির মালিকানার বিষয় নির্ধারণ করা হয়।

চতুরোহংশান্ হরেদ্বিপ্রস্ত্রীনংশান্ ক্ষত্রিয়াসুতঃ।
বৈশ্যাপুত্রো হরেদ্ব্যংশমংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ॥

ব্রাহ্মণীর পুত্র চার অংশ, ক্ষত্রিয়ার পুত্র তিন অংশ, বৈশ্যার পুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রার পুত্র এক অংশ লাভ করবে। (৯/১৫৩)।

যদ্যপি স্যাত্তু সৎপুত্রো হ্যসৎপুত্রোহপি বা ভবেৎ।
নাধিকং দশমাদ্দদ্যাচ্ছুদ্রাপুত্রায় ধর্মতঃ॥

ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র বিদ্যমান থাকুক আর নাই থাকুক শূদ্রাস্ত্রীর পুত্রকে দশমাংশের বেশি দেবে না, এ-ই হলো ধর্মসঙ্গত ব্যবস্থা। (৯/১৫৪)।

একে তো কন্যাসন্তানের পিতৃ-সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকৃতই হয় নি, তারপরও নারীর জন্মজাত বর্ণ-অবস্থানের ভিত্তিতে তার গর্ভজাত পুত্রের সম্পত্তি-অধিকারে বৈষম্য সৃষ্টি করে মূলত নারীকেই আরেক দফা নিবর্তনের শিকার করা হয়েছে। এই নিবর্তন হীনজাতীয়া হওয়ার কারণে শূদ্রা নারীর ওপরই তীব্রতম। দ্বিজাতি পুরুষের শূদ্রাস্ত্রীর পুত্রকে কোনো অবস্থাতেই দশমাংশের বেশি দেয়া যাবে না। আবার আরেক জায়গায় বলা হচ্ছে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশ্যাং শূদ্রাপুত্রো ন বিক্থভাক্।
যদেবাস্য পিতা দদ্যাত্তদেবাস্য ধনং ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এদের শূদ্রা নারীর গর্ভজাত পুত্র ধনাদির অংশ পাবে না। তবে পিতা তাকে স্বেচ্ছায় ধনের যা দিয়ে যাবেন তা-ই তার ধন হবে— তাই তার ভাগস্বরূপ হবে। (৯/১৫৫)।

তবে শূদ্র পুরুষের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের স্ত্রী গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই, তাই তার সন্তানাদির ক্ষেত্রে সংগত কারণেই কোনো বৈষম্য আরোপ দেখা যায় না।

শূদ্রস্য তু সবর্ণৈব নান্যা ভার্যা বিধীয়তে।
তস্যা জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুর্যতি পুত্রশতং ভবেৎ॥

শূদ্রের কিন্তু একমাত্র সবর্ণা স্ত্রী-ই ভার্যা হবে, অন্য কোনও জাতীয়া ভার্যার বিধান নেই। কাজেই শূদ্রের সজাতীয়া পত্নীতে যে সব পুত্র জন্মাবে তারা সংখ্যায় একশ জন হলেও সকলের পৈতৃক ধনসম্পত্তির অংশ সমান সমানই হবে। (৯/১৫৭)।

এভাবেই সমাজকর্তৃত্ব দারিদ্র্যসাম্যের ক্ষেত্রে যে উদার থাকে, তা হয়ত ক্ষমতাসীনদের কর্তৃত্বের প্রতি যেখানে কেউ হুমকিস্বরূপ হয় না সেখানেই। তবে সেখানেও কন্যাসন্তানের সম্পত্তির অধিকার প্রযোজ্য হয় না।

পিতৃতন্ত্রে পুত্র যেমন ক্ষমতা ও আধিপত্যের প্রতীক, একইভাবে পিতৃতন্ত্র কর্তৃক নারীকে ইচ্ছানুরূপ ভোগ ও ব্যবহারের প্রতীকও পুত্র। এই প্রতীকী অবস্থান প্রকাশমান হয় পুত্রকে পিতৃসম্পত্তির অধিকার বণ্টনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তাই উত্তরাধিকার নির্বাচন কেবল নারী-নিবর্তন ও বঞ্চনার ইতিহাসই নয়, একইসাথে নারী-নিবর্তনের বহুমাত্রিক চিহ্নায়কও। মোটকথা পুরুষকর্তৃক বহুভোগ্যা নারীকে ব্যবহারের মাত্রা, অবস্থান ও বৈচিত্র্যের প্রকার-প্রক্রিয়ার ওপর পুত্ররূপ ফলাফলের প্রকার-পরিস্থিতি বিবেচনাকে গ্রাহ্য করেই উত্তরাধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যমূলক প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয়েছে। এটাই নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের স্পষ্টরূপ আধিপত্য ঘোষণা। এটা পিতৃতন্ত্রের বদমায়েশিকে নারীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া হলেও কোনো লুকোছাপের বিষয় হয় নি। আর এই নির্লজ্জ ঘোষণা বলবৎ হয় উৎপাদিত পুত্রের জাতিবাচক নামকরণ কিংবা প্রকার নির্দেশের

মাধ্যমে। ভিন্ন বর্ণের অনুলোম-প্রতিলোম সম্পর্কের কারণে সৃষ্ট বিভিন্নরকম সন্তানের বহুধরনের নামকরণ মনুসংহিতায় রয়েছে যাদের অধিকাংশই অস্পৃশ্য বা চণ্ডাল শ্রেণিভুক্ত, যাদের পুত্র বলেই স্বীকার করা হয় না। তবে মনুশাস্ত্রে সম্পত্তি বণ্টনার্থে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে কারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, কারা হবে না তাও নির্দেশ করা হয়েছে।

ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥

ঔরস (সমানবর্ণা ভার্যাতে নিজের উৎপাদিত পুত্র— legitimate son of the body), ক্ষেত্রজ (সমানবর্ণা ভার্যাতে অন্য ব্যক্তির দ্বারা উৎপাদিত পুত্র— son begotten on a wife of another), দত্তক (অন্যের পুত্রকে নিজ পুত্র হিসেবে গ্রহণ— adopted son), কৃত্রিম (মাতাপিতাহীন বালক, যাকে কেউ টাকা-জমি প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছে— a son made), গূঢ়োৎপন্ন (স্বামীর ভার্যাতে সজাতীয় অজ্ঞাত পুরুষকর্তৃক উৎপন্ন পুত্র— son secretly born), এবং অপবিদ্ধ (যে পুত্র মাতা-পিতাকর্তৃক পরিত্যক্ত এবং অন্যের দ্বারা পুত্ররূপে গৃহীত— a son cast off)— এই ছয় প্রকারের পুত্র গোত্র-দায়াদ এবং বান্ধব (অর্থাৎ এরা সপিণ্ড ও সগোত্রদের শ্রাদ্ধতর্পণ করতে পারে এবং গোত্রধারী ও ধনাধিকারীও হয়— six heirs and kinsmen)। (৯/১৫)।

কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষডদায়াদবান্ধবাঃ॥

কানীন (অবিবাহিতা নারীর পুত্র— son of an unmarried damsel), সহোঢ় (বিবাহের আগে যে নারী অন্তঃসত্ত্বা হয় সে যে পুত্রকে বিবাহের সময়ে সঙ্গে নিয়ে আসে— son received with the wife), ক্রীত (যে পুত্রকে তার পিতা-মাতার কাছ থেকে ক্রয় করে পুত্র করা হয়— the son bought from his parents), পৌনর্ভব (পুনর্ভূ অর্থাৎ পুনর্বিবাহিত স্ত্রীলোকের সন্তান— son begotten on a re-married woman), এবং শৌদ্র (দ্বিজের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র— the son of a sudra female)— এই ছয় প্রকার পুত্র গোত্র-দায়াদ নয়, কেবল বান্ধব অর্থাৎ শ্রাদ্ধপিণ্ডাদির অধিকারী হয় মাত্র, ধনাধিকারী নয়। (৯/১৬০)।

সাধারণভাবে ঔরসপুত্রই পিতৃসম্পদের অধিকারী হয়। অন্য পুত্রদের দেয়া হয় মূলত পাপ-পরিহারের কারণে।

এক এবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্য বসুনঃ প্রভুঃ।
শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনম্॥

একমাত্র ঔরসপুত্রই পিতার ধনসম্পত্তির অধিকারী হবে। তবে পাপ পরিহারের জন্য অর্থাৎ না দিলে পাপ হবে বা নিষ্ঠুরতা হবে— এই কারণে সেই ঔরসপুত্র অন্যান্য পুত্রগণের গ্রাসাচ্ছাদানের উপযোগী ধনদানের ব্যবস্থা করবে। (৯/১৬৩)।

অর্থাৎ পিতৃতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের পুত্র উৎপাদনে পাপ বা নিষ্ঠুরতা নেই। যদিও পুরুষের এমন উদার মনও কানীন পুত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতাই পালন করে। তবে চূড়ান্তভাবে এ-ও বলা হচ্ছে—

সর্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।
সর্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্মনুঃ॥

একই ব্যক্তির বহু পত্নী থাকলে তাদের মধ্যে একজনও যদি পুত্রবতী হয়, তাহলে ঐ পুত্রের দ্বারা অন্যান্য সকল পত্নী পুত্রবতী বলে পরিগণিত হবে অর্থাৎ তারা আর দত্তক-পুত্র নিতে পারবে না— এ কথা মনু বলেছেন। (৯/১৮৩)।

এদ্বারা প্রকারান্তরে পুরুষকে তার যোগ্য উত্তরাধিকারী উৎপাদনের লক্ষ্যে পুনর্বিবাহের কথাই নির্দেশ করা হচ্ছে। সেই উত্তরাধিকারী হবে পিতৃতন্ত্রেরই সুযোগ্য রক্ষক। নইলে পিতৃতন্ত্র কতটা নির্দয় মমতাশূন্য হতে পারে তার আরেকটি নমুনা হচ্ছে—

অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ॥

ক্লীব, পতিত (outcastes), জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়-অর্থাৎ বিকলান্তঃকরণ, বর্ণের অনুচ্চারক মূক এবং ঐরকম কাণা প্রভৃতি বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি— এরা কেউই পিতার ধনসম্পত্তির অংশভাগী হবে না। (৯/২০১)।

সর্বেষামপি তু ন্যায্যং দাতুং শক্ত্যা মনীষিণা।
গ্রাসাচ্ছাদনমত্যন্তং পতিতো হ্যদদদ্ভবেৎ॥

তবে যারা রিক্তভাগী অর্থাৎ ধনসম্পত্তি লাভ করবে, তারা সুবিবেচনাপূর্বক যথাশক্তি ঐ সব ক্লীব প্রভৃতিকে যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবে— তা না করলে তারা পতিত হবে। (৯/২০২)।

পিতৃতন্ত্রে নারীকেও হয়ত এই সমান্তরালেই বিবেচনা করা হয়েছে।

করুণার ধন স্ত্রীধন

পিতৃসম্পদে নারীর কোনো উত্তরাধিকার নেই। কিন্তু যে ধনটুকুতে নারীর অধিকার স্বীকৃত, তা হচ্ছে স্ত্রীধন। তবে এটা এমনই ধন যা নারীর প্রতি করুণার ধনই বলা যায়। মনুশাস্ত্রে ছয় ধরনের স্ত্রীধনের উল্লেখ রয়েছে, যা বণ্টনেও জটিলতা রয়েছে—

অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্মণি।
ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্॥

স্ত্রীধন ছয় প্রকার— অধ্যাগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, মাতৃদত্ত ও পিতৃদত্ত। অধ্যাগ্নি-স্ত্রীধন হলো বিবাহকালে পিতাপ্রভৃতিদের দ্বারা দত্ত ধন, অধ্যাবাহনিক ধন হলো পিতৃগৃহ থেকে পতিগৃহে নিয়ে আসার সময় যে ধন লব্ধ হয়, প্রীতিদত্ত ধন হলো রতিকালে বা অন্যসময় পতি কর্তৃক প্রীতিপূর্বক যে ধন স্ত্রীকে প্রদত্ত হয়। (৯/১৯৪)।

এই স্ত্রীধনের মালিক স্ত্রী হলেও সামাজিক বাস্তবতা হচ্ছে তা সাধারণভাবে স্বামীর রক্ষণাবেক্ষণেই থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে স্বামীই তা ভোগ করে। যদিও তা ভোগ করার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতি নেয়ার নৈতিক দায়িত্ব থাকে, বাস্তবে তা পালিত হয় না।

এই স্ত্রীধন রেখে স্ত্রীর মৃত্যু হলে তা বণ্টনেরও একটি নির্দেশিকা রয়েছে—

অন্বাধেয়ঞ্চ যদ্দত্তং পত্যা প্রীতেন চৈব যৎ।
পত্যৌ জীবতি বৃত্তায়াঃ প্রজায়াস্তদ্ধনং ভবেৎ॥

বিবাহের পর পিতা, মাতা, স্বামী, পিতৃ-কুল এবং ভর্তৃকুল থেকে লব্ধ যে ধন তাকে সাধারণভাবে 'অন্বাধেয়' বলা হয়। স্ত্রীলোকের 'অন্বাধেয়' ধন এবং তার পতিকর্তৃক তাকে প্রীতিপূর্বক প্রদত্ত যে ধন তা-ও স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রীলোকের মৃত্যু হলে তার সন্তানেরা পাবে। (৯/১৯৫)।

এই সন্তান বলতে এই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যারা সমান ভাগ প্রাপ্য (৯/১৯২)। আর তার বিবাহিত কন্যার যদি অবিবাহিত কন্যা অর্থাৎ অবিবাহিতা দৌহিত্রী থাকে তাদেরও মাতামহীর ধন থেকে কিছু কিছু অংশ দিয়ে সম্মানিত ও সন্তুষ্ট রাখতে (৯/১৯৩) বলা হয়েছে। কিন্তু নিঃসন্তান অবস্থায় স্ত্রীধন রেখে কোনো স্ত্রীলোক মারা গেলে—

ব্রাহ্মদৈবার্ষগান্ধর্বপ্রাজাপত্যেষু যদ্ধসু।
অপ্রজায়ামতীতায়াং ভর্তুরেব তদিষ্যতে॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব ও প্রাজাপাত্য— এই পাঁচপ্রকার বিবাহে লব্ধ যে স্ত্রীধন, তার সবই কোনও স্ত্রীলোক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে তার স্বামীই পাবে। (৯/১৯৬)।

যৎ তস্যাঃ স্যাদ্ধনং দত্তং বিবাহেষ্বাসুরাদিষু।
অপ্রজায়ামতীতায়াং মাতাপিত্রোস্তদিষ্যতে॥

আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ— এই তিন প্রকার বিবাহে লব্ধ যে স্ত্রীধন, তা রেখে কোনও স্ত্রীলোক যদি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাহলে ঐ ধনে ঐ স্ত্রীর মাতার প্রথম অধিকার, কিন্তু মাতার মৃত্যু হলে পিতা অধিকারী হয়। (৯/১৯৭)।

মূলত ক্ষমতাকেন্দ্রিক উত্তরাধিকারে নারীর কোনো অধিকার না থাকায় এই করুণালব্ধ স্ত্রীধন যে আসলে একধরনের ভিক্ষালব্ধ ধনই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সামাজিক বাস্তবতা হচ্ছে, এই সামান্য ধনও আসলে স্ত্রী ভোগ করে যেতে পারে না। এজন্যেই হয়ত মৃত্যুপরবর্তীকালে তা বণ্টনের নির্দেশনা মনুশাস্ত্রে দেখা যায়। তাছাড়া স্মৃতিশাস্ত্র নির্দেশিত বিধানে স্ত্রীর কোনো আলাদা সত্তাই থাকে না।

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ ধনম্॥

স্মৃতিকারগণের মতে, ভার্যা, পুত্র ও দাস— এরা তিনজনই অধম (বিকল্পপাঠ— অধন); এরা তিনজনেই যা কিছু অর্থ উপার্জন করবে, তাতে এদের কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, পরন্তু এরা যার অধীন ঐ ধন তারই হবে। (৮/৪১৬)।

অতএব, চূড়ান্ত বিচারে নারী কোনো ধন-সম্পদেরই অধিকারী হতে পারে না। কেননা সে নিজেই ভোগ্যা, পিতৃতন্ত্রের উপাদেয় ভোগ্যসামগ্রী। সে অন্যের ব্যবহার্য ধন মাত্র, কিছুতেই নিজের নয়; এবং এভাবেই পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার বলয়ে কুক্ষিগত নারী শেষপর্যন্ত নারীই থেকে যায়, মানুষ হতে পারে না।

অতঃপর নারী অধিকার ও সামাজিক প্রেক্ষিত

সমাজের অনিবার্য অংশ হয়েও যৌক্তিক সামাজিক ক্ষমতার অধিকার থেকে যাবতীয় নিবর্তনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীকে বিতাড়নের গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছে পুরুষ তার পিতৃতান্ত্রিক হাতিয়ার তথা ধর্মশাস্ত্র নাম দিয়ে কতকগুলো বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক শাসনতান্ত্রিক অনুশাসন সৃষ্টির মাধ্যমে। আর এই ধর্মসৃষ্টির হোতা যে পুরুষই, এসব ধর্মশাস্ত্রে কথিত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী স্রষ্টার পুরুষপ্রকৃতি এবং নারীকে পুরুষকর্তৃক ভোগ-ব্যবহারের উদগ্র প্রকাশই এর প্রমাণ। কোনো অলৌকিক ঈশ্বরের চিন্তারাজিতে তাঁর সৃষ্টি বিষয়ক বিষয়বস্তু নিয়ে এতটা অরুচিকর অবনমন ও বৈষম্য অচিন্তনীয়। বৈদিক ধর্মে

মনুসংহিতা হচ্ছে এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এবং পরবর্তীকালের সৃষ্ট ও প্রচলিত অন্য ধর্মকাঠামোগুলোও মনে হয় তারই আরেকটু উৎকর্ষ ও বিবর্তিত প্রতিরূপ মাত্র। এর মাধ্যমেই তথাকথিত ধর্মশাস্ত্র সৃষ্টির পূর্বের নারী আর পরবর্তীকালের ধর্মপ্রবাহে নারীর অবস্থার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায় শাস্ত্র-নির্দেশিত অনুশাসনগুলোর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে। অর্থাৎ পরবর্তীকালের এই নারী সম্পূর্ণই পুরুষের ইচ্ছার প্রতীক এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজসৃষ্ট, যাকে মনুসংহিতার মতো কথিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলোর মাধ্যমে বৈধরূপে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই নারীর প্রকৃত অন্তর্জগৎ আর পুরুষসৃষ্ট এই সামাজিক নারীতে আরোপিত জগৎ কখনোই এক নয়। পুরুষের ক্ষমতার বলয়ে বন্দি নারীর নিজস্ব ওই জগৎটা শেষপর্যন্ত একান্ত গোপন ও সুপ্তই রয়ে গেছে। তাকে কখনোই বাইরে আসতে দেয় নি পুরুষ, সেই জগৎটিকে অস্বীকারের মাধ্যমে। আর যে আক্রান্ত নারীটিকে ইচ্ছার বর্বরতা দিয়ে নিজের মতো করে সাজিয়েছে পুরুষ, সেটাই বহিঃবাস্তবের সামাজিক নারী। এ নারী আসলে এক কল্পিত নারীই, যে কিনা পুরুষের অসভ্য মনের মাধুরি মেশানো প্রতিকৃতি। তাই নারীর মুক্তি মানে এই অসভ্য ক্ষমতার কবল থেকে মানবিক নারীসত্তার মুক্তি। অবগুণ্ঠিত অন্তর্জগতের ঘেরাটোপ থেকে মানুষ হিসেবে বাইরে বেরিয়ে আসার অধিকারই নারী-অধিকার। যেখানে সে তার মুক্তির আনন্দে নারী থেকে মানুষ হয়ে উঠবে। কিন্তু মানবিক বোধ বর্জিত পিতৃতন্ত্র কি কখনো তা হতে দেবে?

পিতৃতন্ত্রের সাফল্যের প্রধান চাবিকাঠি হচ্ছে তার ধর্মজাগতিকতা, কাল্পনিক ঐশিকতায় অপ্রমাণিত এক পারলৌকিক জগৎ তৈরি করে যেখান থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের শাসনতান্ত্রিক সুতোটাকে ধরে রেখেছে। এটাই তার ক্ষমতার উৎস, যা সে নিজেই সৃষ্টি করেছে। এবং এই ক্ষমতাই তার অস্তিত্ব। এখানে সামান্য আঁচড়টুকু পড়তে গেলেই, কিংবা সামান্যতম আঁচড় লাগার কোনো কল্পিত সম্ভাবনা তৈরি হলেও সে মারমুখী হয়ে ওঠে। দেশীয় প্রেক্ষাপটে বা বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর উগ্রবাদী ক্রিয়াকলাপ এই রেশই বহন করছে। অতএব, নারী-পুরুষের সমতা বিধান তথা সার্বিক সামাজিক মঙ্গলবিধানের উপায় খুঁজতে হলে এক চিরায়ত মানবতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়ার কোনো গত্যন্তর নেই বলেই মনে হয়। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সেই কল্যাণমূলক ক্ষমতায় উন্নীত করতে হবে, যাতে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মানবিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের ওপর নিবর্তনমূলক সব ধরনের ধর্মীয় কুশাসন রাষ্ট্রীক ও সামাজিকভাবেই রদ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এজন্যে প্রথমেই দরকার রাষ্ট্র কর্তৃক সব ধরনের ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করা। ধর্ম যে আসলে কোনো অলৌকিক বস্তু বা ধারণা নয়, তা মানুষেরই সৃষ্টি এবং সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতাকেন্দ্রিক পুরুষতান্ত্রিক বৈষম্যমূলক কূটভাবনার আর্থ-সামাজিক রূপই যে ধর্ম, এই বিজ্ঞান চেতনা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে মুক্তচিন্তাকে শানিয়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতে হবে রাষ্ট্রকেই। আর এই উদ্যোগ নিতে হবে মুক্ত-চেতনায় বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীকেই।

এ প্রেক্ষিতে একটা বিষয় অনুধাবনযোগ্য যে, প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রগুলোয় উল্লেখকৃত সামাজিক আবহ আদতে দেড় থেকে দু'হাজার বছর বা তারও আগের সমাজকাঠামোয় সৃষ্ট। মনুসংহিতার নারী প্রতীকগুলোও সেই দু'হাজার বছর আগেরই প্রতিকৃতি। ইতোমধ্যে সমাজ বিকাশের সুদীর্ঘ ধারায় সভ্যতার বহু বহু পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হওয়ার ফলে সেইসব শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সবগুলো এখন আর সামাজিকভাবে প্রয়োগ করা হয় না বা তার প্রয়োগযোগ্যতাই নেই। এবং কালান্তরে এসে এগুলো অবিকল বা একেবারেই প্রয়োগ না করার কর্তৃত্বে এক ধরনের অধিকারবোধও রাষ্ট্রকাঠামোয় সংযোজিত হয়েছে। রাষ্ট্রের জনচেতনাও সেভাবেই বিকশিত হয়ে গেছে। তাই এমন ধারণা বদ্ধমূল করা মোটেও ঠিক নয় যে, রাষ্ট্র চাইলে সমস্ত ধর্মজাগতিকতাকে সরিয়ে তার জনমত প্রভাবিত হরে কোনো জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে না। রাষ্ট্র চাইলে অবশ্যই তা পারে। এজন্যেই ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। এ প্রেক্ষিতে যেকোনো ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকেই বর্জনের সপক্ষে মানবিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকদের একাট্টা হওয়া জরুরি। তার জন্যে দরকার মুক্তচিন্তা প্রকাশের অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা। এটা নিশ্চিত করা না গেলে বাকি অর্জনগুলোও সুদূরপরাহতই থেকে যাবে। এবং নারীর অধিকার একটা অধরা কাল্পনিক বিষয় হয়েই থাকবে।

অতএব, যে মাতৃ-নারীর গর্ভ থেকে উৎপন্ন পুরুষ, আমৃত্যু মঙ্গলকামী সুহৃদ হিসেবে যে প্রিয়তমাকে সাথে নিয়ে গোটা জীবন পাড়ি দেয় পুরুষ, এবং যে অপত্যস্নেহে কন্যাশিশুটির নিষ্পাপ মুখের দিকে চেয়ে পিতৃবাৎসল্যে ঝলমল করে উঠতে পারে একজন পুরুষ, সেই নারীকে কোনো মানবিক পুরুষ নিজের মতো মানুষ হিসেবে ভাবতে না পারার কোনো কারণ কি থাকতে পারে! যে পুরুষ তা ভাবতে পারে না, সে মানুষ হতে পারে না। আর মানুষ হতে না-পারা অমানুষের জন্য একটা সুন্দর পৃথিবী এবং মানুষের স্বপ্নময় জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, তা কি আদৌ কাম্য কারো?

রণদীপম বসু লেখক, ব্লগার ও উন্নয়নকর্মী। ranadipam@gmail.com

তথ্যসূত্র

১. ঋগ্বেদ-সংহিতা : অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৭৬, কলকাতা।
২. মনুসংহিতা : সম্পাদনা মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলভ সংস্করণ, বইমেলা ১৪১২, কলকাতা।
৩. ভারতীয় দর্শন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, কলকাতা।
৪. ভারতীয় শাস্ত্রে নারীকথা : সিরাজ সালেকীন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, ঢাকা।
৫. অবমুক্ত গদ্যরেখা : রণদীপম বসু, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১, ঢাকা।